

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদক

ড. রাজেশ কুমার সাহা

সহযোগী সম্পাদক

ড. কৌশিক কর্মকার

দেবায়ন চৌধুরী

বিদ্যা ভারতী
উচ্চ শিক্ষা সংস্থান
Vidya Bharati
Uchcha Shiksha Sansthan

Bharatiya Jnana Parampara

A collection of Peer-Reviewed Research Articles presented in the Teachers' Convention organized by Vidya Bharati Uchcha Shiksha Sansthan (VBUSS), in collaboration with National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL), Govt. of India on 28th January, 2024 at National Institute of Technical Teachers' Training and Research (NITTR), Kolkata.

Edited by Dr. Rajesh Kumar Saha

First Imprint : 6th April 2024

ISBN : 978-81-969391-8-2

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা (নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন)

বিদ্যা ভারতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থান কর্তৃক আয়োজিত, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ সিন্ধি ল্যাঙ্গুয়েজ, ভারত সরকারের সহযোগিতায় ২৮ জানুয়ারি ২০২৪-এ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতায় অনুষ্ঠিত, শিক্ষক সম্মেলনে উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি।

প্রথম প্রকাশ : ৬ এপ্রিল ২০২৪

প্রকাশক : পাড়ি
প্রযত্নে – সওদাগর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা – ৭০০১৪৪
Email : soudagarbooks@gmail.com

প্রচ্ছদ : ড. সুরজিৎ চন্দ
বর্ণ সংস্থাপন : ড. প্রণব নস্কর
মুদ্রক : আল্‌ফাবিটা ইম্প্রেশন, কলকাতা – ১৪২

মূল্য : ৩০০ টাকা

ভূমিকা

আমরা এক অদ্ভুত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। অস্থির সমাজ আর অস্থির আমাদের মন। পিতামাতাদের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং দুশ্চিন্তার কারণ এখন তাঁদের সন্তান। পুঁজিবাদী মানসিকতার দৌরাত্ম্যে এবং ঔপনিবেশিক দাসত্বের দীর্ঘ প্রভাবের কারণেই পিতামাতাদের প্রথম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের সন্তানের জন্য বিদ্যালয় নির্বাচন। জনসংখ্যার তড়িৎ গতিতে বৃদ্ধি এবং সম্পদের অসম বন্টন, মধ্যবিত্ত সমাজের ভবিষ্যৎ করে তুলেছে অনিশ্চিত। সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে যায় ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি নিয়ে। সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়লে সন্তান পিছিয়ে যাবে, বিশ্বায়নের যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে না, আইআইটি আর মেডিকেলের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না, এইরকম হাজারও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে তথাকথিত খুব ভালো ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তারা তাদের সন্তানকে ভর্তি করে। সপ্তম শ্রেণি থেকেই আইআইটি, মেডিকেল প্রবেশিকার প্রস্তুতির নামে মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। কোটি কোটি টাকার মুনাফা লোটা হয় ছোট ছোট বাচ্চাদের সর্বনাশ করে। এমন অনেক বাবা-মায়েরা আছেন যারা কেবল সন্তানকে ভালো ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াবেন আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার করবেন বলে গ্রাম এবং মফস্বলের বড় বাড়ি, জমিজায়গা বিক্রি করে কলকাতা শহরের আশেপাশে একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজেন। পরিজন, বন্ধুবান্ধব, নিজের পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করেন সন্তানকে ঘিরে; আর এই ত্যাগের কারণে বাবা-মায়ের মধ্যে যে ব্যাপক তাড়না তৈরি হয় তা স্বপ্ন আকারে আছড়ে পড়ে ছোট্ট শিশুটির ওপর।

গুণগত মানের শিক্ষা কী? একটি বাচ্চার বৌদ্ধিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত? বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের কোথায় যোগসূত্র, এই সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না থাকায়, পুঁজিবাদীদের ঝাঁ চকচকে পরিবেশ দেখে এবং বিজ্ঞাপনসর্বস্ব পৃথিবীতে অজান্তেই তাঁরা সন্তানের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে বসেন। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় দায়বদ্ধতার অভাব, রাজনৈতিক স্বজনপোষণসহ একাধিক কারণও পিতামাতাদের এই ভুল পথে চালিত করে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ভুল আমরা করে বসি। প্রিয়জনের ভাল চিকিৎসার আশায় ঘটি বাটি সব বিক্রি করেও বেসরকারি ঝাঁ চকচকে নার্সিংহোমে যাই; এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়ে সর্বস্বান্ত হই।

আপনাদের মনে হতেই পারে যে ‘ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা’ নিয়ে বই-এর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গ অবতারণার কী প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে; কারণ ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেই আমরা পারব না, যদি না বর্তমানে আমাদের সংকটকে আমরা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। আপনাদের সকলের হয়তো মনে আছে যে, কিছু দিন আগে চন্দ্রযানের সফল অভিযানের পর সংবাদপত্রে একাধিক বাঙালি বিজ্ঞানীর সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছিল। এঁরা সকলেই ইসরোর চন্দ্রাভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যারা খবরগুলো পড়েছিলেন একটু মনে করে দেখুন এঁরা সকলেই ছিলেন মফস্বলের বাংলা মাধ্যমে পড়া ছাত্র। এঁদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সেই জীবন সংগ্রামের কাহিনিগুলো সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। অথচ দেখুন তথাকথিত ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে যখন কোন রকমে একটি বেসরকারি জায়গায় কাজ পায়, তখন অবশেষে বাবা-মায়েরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

জাপান, কোরিয়া, ইজরায়েল, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া এরকম কত উন্নত দেশ আছে যেখানে গবেষণা পর্যন্ত মাতৃভাষায় হয়। আসলে মুখে ‘মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ’ বলে চিৎকার

করলেও বা ভাষা দিবস উপলক্ষে বড় বড় ভাষণ দিলেও বাস্তবে আমরা খুঁজে বের করি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

মাতৃভাষায় না শিখলে সত্তার গঠন ঠিক ভাবে হয় না। আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত হই একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আর শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই সংস্কৃতিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। ইউনেস্কো গুণগত মানের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার জোর দিয়েছে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, পরম্পরা, প্রেক্ষাপটকে এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর। উপরি-উক্ত দেশগুলি এটা নিশ্চিত করেছে বলেই আজ তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে অনেক এগিয়ে।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে একহাজার বছর, খুবই ছোটো সময়। এক হাজার বছর আগে পর্যন্ত ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা ছিল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমরা হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কথা ইতিহাসে অল্পবিস্তর জেনেছি। সরস্বতী সভ্যতা যা সরস্বতী নদীর উপকূলে গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল প্রাচীন সভ্যতা। সনাতনী সভ্যতাকে ধ্বংস করার সহস্রাধিক প্রচেষ্টা এবং ইংরেজদের গভীর চক্রান্তে, দেশ স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস, গৌরবময় অধ্যায় আমাদের খুব সচেতন ভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গণিত, জোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্যসহ সকল বিষয়ে প্রথম ছিল আমাদের মাতৃভূমি অবিভক্ত ভারতবর্ষ। ধাতু নিষ্কাশন, নগর পরিকল্পনাসহ অনেক কিছুরই নিদর্শন আমরা পেয়েছি আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের সভ্যতা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয়। এত চক্রান্তের পরও কিছু জিনিস এখনও রয়ে গিয়েছে যা আমাদের উৎকর্ষ, জ্ঞান পরম্পরার প্রমাণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সারা পৃথিবী এখন যোগশাস্ত্রের গুণে মোহিত। অথচ পতঞ্জলি, তিরুমালাই কৃষ্ণমাচার্যসহ প্রাচীন যোগগুরুদের সকলের নাম পর্যন্ত আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাণিনির ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষা যা বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সব উপেক্ষিত ছিল শিক্ষাব্যবস্থায়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও শিক্ষানীতি পরিচালিত হয়েছিল পাশ্চাত্যকে অন্ধ অনুকরণ করেই। যা আমাদের

নিজেকে হীন ভাবতেই শিখিয়েছিল। বিকৃত ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনের গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভারতবর্ষ মানেই জাতপাত, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, দাসত্ব। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশ নিজের দীর্ঘ গৌরবের অতীত বাদ দিয়ে কেবলমাত্র লাঞ্ছনার ইতিহাসকে বিকৃতভাবে তুলে ধরতে পারে না। আমাদের সভ্যতার ইতিহাসকে সুচারু ভাবে ভুলিয়ে দিয়েছে বলেই প্রতি পদে পদে কেবলই পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। আমাদের মেধাশক্তি স্রোতের মতো পাড়ি দেয় ভিনদেশে। এই শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করতে পারেনি বলেই, আমাদের প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

নিকষ অন্ধকারের পর যেমন আলোর রেখা ঠিকই দেখা যায়, তেমনি অবশেষে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' প্রণয়নের মাধ্যমে সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে পুনঃজাগরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এন.সি.ই.আর.টি. সকল মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করছে। ভারতীয় সংস্কৃতির আধারে পাঠক্রম রচনা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানচর্চাসহ সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে করার প্রয়াস বর্তমানে সর্বত্রই পরিলক্ষিত। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার গুরুত্ব সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে যত্ন সহকারে তুলে ধরা হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী ধীরে ধীরে অনুধাবন করছে ভারতীয় জীবনদর্শনের গুরুত্ব।

আবার চক্রান্ত চলছে সমানতালে ভারতের এই অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার। প্রকৃত ভারতের উজ্জ্বল অতীত ইতিহাসে তুলে ধরে গভীর জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করার প্রচেষ্টাকে 'ইতিহাস বিকৃতি', 'শিক্ষার গেরুয়াকরণ' এই সকল উপমা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চলছে নিরন্তর।

আমরা সম্মিলিতভাবে 'বিদ্যা ভারতী উচ্চ শিক্ষা'-র তরফ থেকে সৎ, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে এই চক্রান্তকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করে চলেছি। সেই কারণেই গত ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ আমরা 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা'-র ওপর এক শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের মাননীয়

সন্ন্যাসীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আচার্য এবং অসংখ্য গবেষক এই সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে সমস্ত লেখার মধ্য থেকে, বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত প্রবন্ধাবলির সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এই পুস্তক প্রকাশনার উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে সকলের কাছে তুলে ধরা এবং অন্যদিকে গবেষণায় রত শিক্ষক এবং গবেষকদের গবেষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। আহ্বায়ক হিসেবে এই দায়বদ্ধতা আমার ছিল। আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত বিদ্যা ভারতীর সকল সদস্যের সক্রিয় ভূমিকায়। আমাদের আহ্বানে শিক্ষক, অধ্যাপক ও গবেষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আপ্লুত বোধ করছি। সকলের সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলন আমরা বিদ্যা ভারতীর পক্ষ থেকে পাঠকের দরবারে হাজির করতে পারতাম না। আপনাদের সকলকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই।

প্রফেসর ড. রাজেশ কুমার সাহা
আহ্বায়ক
বিদ্যা ভারতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থান, পশ্চিমবঙ্গ

সূচিপত্র

প্রাচীন ভারতের লিখনসামগ্রী
ড. নিতাই জানা ১১

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি
ড. পরিমল মণ্ডল ১৬

বৈদিক থেকে আধুনিক ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় শিক্ষা পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পরিবর্তন
কাবেরী মণ্ডল ও বর্ষা মণ্ডল ২১

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি সংস্কৃত ভাষা
সুপর্ণা মণ্ডল ৩০

ধর্ম ও দর্শন : মানবিক অভিজ্ঞতার দুই পাখনা
সোমনাথ রায় ও সুস্মিতা নস্কর ৪৪

পাশ্চাত্য নয় প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষা প্রদানের শুরু ভারতেই
প্রবীর দে ৫০

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাব্যবস্থার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও অনুবাদ : *রামায়ণ*-এর সূত্রে
দেবলীনা সেন ৫৮

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মনীতি : বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের আলোকে একটি দার্শনিক সমীক্ষা
রোহিত দাস ৮০

দলিল-দস্তাবেজের পুথিচর্চা : বাঙালির এক অনালোচিত অধ্যায়
ড. শুভাশিষ গায়েন ৯০

ড. সুকুমার সেনের দৃষ্টিতে সিলভ্যাঁ লেভির প্রাচ্যতত্ত্ব-সাধনা
ড. অমৃতা ঘোষাল ৯৮

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা
ড. অন্তরা চৌধুরী ১১০

চাঁই ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজির তুলনা
পরিমল মন্ডল ১১৫

বাণী বসু-র 'খনামিহিরের ঢিপি' : ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার
ড. শ্রীতা মুখার্জী ১২৫

রান্নাপুজো : একটি লোক-সাংস্কৃতিক পরম্পরা
ড. সুধাংশুকুমার সরকার ১৪২

লেখক পরিচিতি

প্রাচীন ভারতের লিখনসামগ্রী

ড. নিতাই জানা

এখন আমরা অত্যন্ত উন্নত কাগজে লিখে থাকি। যদিও সময়টিকে এখন বলা হচ্ছে, 'পেপারলেস অফিস'-এর কাল। অর্থাৎ কম্পিউটার এসে যাওয়ার পর কাগজের কদর আর পূর্বের মতো নেই। তবুও প্রতিদিন সকালে খবরকাগজ থেকে মাঝেমধ্যে বিকেলের ডাকে পাওয়া চিঠি ইত্যাদি চলছে কাগজের মাধ্যমে। তাছাড়া কাগজে ছাপা বই এবং যত্রতত্র বইমেলা প্রমাণ করে আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশের মাধ্যম কাগজ।

কিন্তু পুরোনো দিনে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ কোথায় লিখত বা কী দিয়ে লিখত আমাদের মনে মাঝেমধ্যে উঁকি মারে এমন একটা কৌতূহল। বৈদিক যুগের মানুষেরা নাকি লিপির ব্যবহার জানতেন না। তাঁরা শ্লোক রচনা করতেন মুখে মুখে। আর তুলে রাখতেন স্মৃতিতে। বংশ এবং শিষ্য পরম্পরায় সেই শ্লোক কানে শুনে শুনে চলত শিখন। তাই সে যুগে ছিল না লিখন সামগ্রী। এ কথার সত্যতা নিয়েও অনেক বাদ-বিবাদ আছে। সে সব তর্ক এবং বিতর্ক এড়িয়ে আমরা বরং পুরোনো দিনের, আজ অবধি পাওয়া, ভারতীয় শিখন সামগ্রী নাড়াচাড়া করতে পারি।

কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ বাদে সমগ্র ভারতে গ্রন্থ্ লেখার কাজে ব্যবহৃত হত তালপাতা। অলবিরুনি একে বলতেন 'তাড়ি' বা 'তাড়িপত্র'। আবার তিনি, তাঁর রচিত বিশাল গ্রন্থে, কোথাও কোথাও একে বলেছেন 'তাল'। জোড়া পাতাগুলি শিরা বরাবর কেটে একটু লম্বা রেখে লিখনের চওড়া অংশটি থাকত ১ থেকে ৪ ইঞ্চি অবধি। প্রথমে পাতাগুলি রোদে শুকনো করে তারপর ডুবিয়ে রাখা হত জলে। কয়েকিন পরে জল থেকে তুলে শুকনো করে শঙ্খ বা কড়ি অথবা অতি মসৃণ পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে পালিশ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলে লেখার উপযোগী হত। এর ঠিক মাঝ বরাবর অথবা ডান কিংবা বামে একটি ছিদ্র করে গলিয়ে বাঁধার কাজটি করত একটি সুতোর ডুরি বা ডোর। উপরে ও নিচে থাকত অনুরূপ

ছিদ্রযুক্ত কাঠের মলাট। এই মলাটের সঙ্গেই বাঁধা থাকত তালপাতাগুলি। আর পড়ার সময় ডুরি ঢিলে করলে সাবলীলভাবে পাতাগুলি ওলটানো যেত, ছড়িয়ে পড়ত না যত্রতত্র। পণ্ডিতেরা এই ডুরিকে বলতেন গ্রন্থি। বলা বাহুল্য, গ্রন্থি থেকেই গ্রন্থ শব্দটির আগমন। ভারতবর্ষে লিপির আধাররূপে বোধ হয়, প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তালপাতা। কেন না, ভগবান বুদ্ধ-এর নির্বাণ বৎসরে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে তালপাতায় লেখা হয়েছিল ত্রিপিটক। এ কথা জানা জায় হিউএন সাঙ লিখিত 'সি-ইউ-কি' গ্রন্থ থেকে। তালপাতা একটি অতি সুলভ সামগ্রী। আর গাছের পাতা যে লিপির আধাররূপে অত্যন্ত প্রাচীন তার প্রমাণ, বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, বল্লী, কাণ্ড, পত্র ইত্যাদি শব্দগুলি গ্রন্থের অঙ্গ হয়ে উচ্চারিত হয়ে চলেছে আজও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের আবহাওয়ার কারণে বেশি দিন টেকে না তালপাতার পুথি। তাই জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণায় এক তালপাতা থেকে আরেক তালপাতায় নকল হয়ে এসেছে গ্রন্থগুলি। এবং ফলস্বরূপ, বিভিন্ন লিপিকরের হাতে বদলে গেছে প্রাচীন লিপিগুলির চেহারা।

অলবিরুনি তাঁর 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের লোকেরা লেখার জন্য ব্যবহার করতেন 'তুজ' বা 'ভূর্জ' গাছের ছাল। তিনি লিখেছেন, ছড়ানো আঙুলের সমান চওড়া এবং এক গজ আন্দাজ লম্বা ছাল নিয়ে লেখার উপযোগী করা হত। আর তেল মাখিয়ে পালিশ করা হত যাতে বাকলটি শক্ত আর মসৃণ হয়ে ওঠে। তার ওপর লেখা হত মসী দিয়ে, আর পাতায় নম্বর দিয়ে বজার রাখা হত সঠিক বিন্যাস। এভাবে গড়ে তোলা গ্রন্থটি দুটি সমানায়তন ফলকের মধ্যে রেখে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখতেন প্রাচীন মানুষ। শুধু তাই নয়, অলবিরুনি লিখছেন, চিঠিপত্র বা অন্য যা কিছু লিখন, সবকিছুর জন্যই ওঁরা ব্যবহার করতেন তুজ গাছের ছাল।

অলবিরুনি যাকে 'তুজ' বা ভূর্জ' বলেন, আমরা তাকে ভোজপাতা বা ভূর্জপত্র বলে জানি। হিমালয় অঞ্চলয়ে এ গাছে পাওয়া জায়। কিন্তু পাতা নয়, পাতার মতো কেটে গ্রন্থিবদ্ধ করা হত ভোজ গাছের ছাল। খোটান প্রদেশে পাওয়া খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা 'ধম্মপদে'র পাতাগুলি এই ভোজ বা ভূর্জবৃক্ষের ছাল। দ্বিতীয় বা তৃতীয় খ্রিস্টাব্দকালের রচনা।

হিন্দু পণ্ডিতগণ পশুচর্মের উপরে লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন না। প্রাচীন কালের গ্রিক পণ্ডিতেরাও তাই-ই। সক্রাতেসকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, গ্রন্থ রচনা করেন না কেন, তখন তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন : মানুষের

প্রাণবন্ত জীবনের জ্ঞান মৃত মোষের চর্মে রূপান্তরিত করতে চাই না আমি। এরকম কথা কোনো হিন্দু বলেননি, কিন্তু, সামান্য কিছু নমুনা যেমন, সুবন্ধুর 'বাসবদত্ত' অথবা প্রাচীন পুথির মধ্যে পাওয়া অলিখিত চামড়ার পাতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। বুলার সাহেবের 'ইন্ডিআন পোলিওগ্রাফি'তে কচ্চায়ন-এর (কাত্যায়ন) ভূমিকা পাঠে জানা যায়, লিপিপত্র হিসেবে চামড়াও ব্যবহার করতেন বৌদ্ধপণ্ডিতগণ। জৈনসাধুদের মধ্যেও চর্মপত্র দূষ্য ছিল না।

ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মী লিপিতে লিখন কর্ম চলছিল তখন গান্ধার অঞ্চলে ছিল খরোষ্ঠীলিপি। খর+ওষ্ঠ+ই= খরোষ্ঠী। চিন দেশের মানুষ একে বলতেন গাধার ওষ্ঠের মতো লিপি। ফা ওআন চু লিন ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'বৌদ্ধ বিশ্বকোষ' রচনা করান। সে গ্রন্থে খর অর্থাৎ গাধার ওষ্ঠের মতো লিপি অর্থ করা হয়েছে। সম্ভবত এই অর্থ একটি মিষ্টি ভুল। মনে হয়, আদিতে শব্দটি ছিল 'খরপুস্তি'। খর যেমন গাধা তেমনি পুস্ত শব্দটির অর্থ চামড়া। অর্থাৎ চামড়ায় লেখা লিপি। আমাদের পুস্তক শব্দটি এই পুস্ত থেকে পাওয়া এবং পুথি শব্দটিও সেই সূত্রে আগত। তাছাড়া, ওই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার নাম পুস্ত। সে যাই হোক, এই খরোষ্ঠীকে কেউ বলেন গান্ধারলিপি। আবার কেউ বলেন নর্থ-অশোক লিপি।

এখনও গ্রামীণ ভারতবর্ষে শিক্ষার্থী শিশুরা বর্ণপরিচয়কালে কালো স্লেট ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীনকালে এই স্লেট ছিল না। সেদিন শিশুরা কালো কাঠের তক্তার উপর খড়ি বুলিয়ে শিখত অক্ষর। এর নাম পাটি বা পাটা। বৌদ্ধ জাতকে এর উল্লেখ আছে। সেদিনের জ্যোতিষীগণ পাটির উপর নবজাতকের জন্মপত্রিকা তৈরি করতেন প্রথমে। তারপর তালপাতা বা ভূর্জপত্রে তুলে রাখতেন। সেই পাটা হয়েছে আজকের শিশুদের স্লেট।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে ভারত আক্রমণকারী গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার-এর তিন সেনাপতির মধ্যে একজন ছিলেন নিআর্কস। তাঁর ভারত আক্রমণের বিবরণ পাঠ করে ম্যাক্সমুলার সাহেব 'হিস্ট্রি অব এনশিয়েন্ট সানসিক্রট লিটারেচার' গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতীয়রা রুই নামক একপ্রকার তৃণ থেতো করে তৈরি করতেন কাগজ। অর্থাৎ রুই বা চিথড়া থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তৈরি হত কাগজ। রুই আসলে শন-জাতীয় একপ্রকার তৃণ। এই কাগজে কালি যাতে না ছাপিয়ে যায়, তাই চালের মণ্ড পাতলা করে কাগজে লেপে দেওয়া হত। তারপর শঙ্খ দিয়ে ঘষে ঘষে করে তোলা হত মসৃণ। কিন্তু এ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাছাড়া ভারতের

জলবায়ুও কাগজ সংরক্ষণের পক্ষে অনুকূল ছিল না। আর তালপাতা ছিল যথেষ্ট সুলভ। তাই ইউরোপ থেকে সস্তা ও সুন্দর কাগজ প্রবেশের পূর্বে রুই বা চিথড়ার প্রচলন ছিল সীমিত। অবশ্য রুই-এর তৈরি কাপড়ের উপর লেখা হত বলেছেন অলবিরুনি। তিনি শুনেছিলেন, কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের বংশাবলী রেশমি কাপড়ের ওপর লিখিত ছিল নগরকোটের কেল্লায়। কিন্তু নানা কারণে তাঁর নগরকোট যাওয়া হয়নি। বুলার সাহেব জৈনসূত্রের সূচি দেখেছিলেন জয়শলমারি। রেশমি কাপড়ের উপর মসীর সাহায্যে লিখিত এই সূচিপত্র।

কিন্তু তালপাতা ভোজবাকল কাগজ কাপড় ইত্যাদি স্থায়ী হবে না অনুমান করেই বোধ হয় প্রাচীন ভারতীয়রা লিখতেন পাথরের ওপর। পাহাড়-পর্বত, স্তম্ভ, পাথরের পাতে তৈরি দেবতার আসন, পাথরের কৌটা অথবা ঢাকনায় লিখন কর্মের চলন ছিল। হরপ্পাতে এর নমুনা আছে। এবং আছে গোটা ভারতবর্ষে। কোনো কবি বা পণ্ডিত অথবা রাজকর্মচারী বয়ানটি রচনা করতেন। তারপর লেখনপটু সূত্রধর পাথরটিকে মসৃণ করে খোদিত করতেন লিপিগুলি। ইটেও খোদিত হত ধর্মীয় সূত্র। প্রথমে কাঁচা ইটে খোদাই করে পরে পুড়িয়ে নেওয়া হত। এই ইটগুলি ছিল সাড়ে এগারো থেকে নয় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা ও চার থেকে সাড়ে চার ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া। গোরক্ষপুর জেলার গোপালপুর থেকে এরকম ইট পাওয়া গেছে যেখানে বৌদ্ধসূত্র খোদিত। অনুরূপ মাটির পাত্র বা টালিতেও লেখা হত। এমনকি মাটির ঢেলার ওপরও চলত লিখনকর্ম।

লিখনপত্র হিশেবে তামা ছিল সর্বাধিক ব্যবহৃত ধাতু। হরপ্পাতেও লিখনকর্ম পাওয়া গেছে তামার উপর। যদিও তার পাঠোদ্ধার হয়নি। সুপ্রাচীনকাল থেকে তাম্রফলকের উপর লিখনকর্ম চলে আসছে গোটা ভারতবর্ষে। এদের বলা হয়, তাম্রপত্র বা পট্ট অথবা তাম্রশাসন। খুব সুন্দর হস্তাক্ষরে কালি দিয়ে পাতের উপর লেখা হত প্রথমে। তারপর সেই লিখনের উপর রেখা টেনে অথবা বিন্দুতে বিন্দু মিলিয়ে অক্ষর খুদে দিতেন শিল্পী। পরিব্রাজক হিউএন সাঙ 'সি-ইউ-কি' গ্রন্থে বলেছেন, পণ্ডিত পার্শ্বর প্রেরণায় মহারাজ কণিষ্ক কাশ্মীরে বৌদ্ধ সঙ্গীতির আয়োজন করেন। সেই সঙ্গীতিতে প্রায় এক লক্ষ শ্লোকে সূত্তপিটকের উপর 'উপদেশশাস্ত্র', 'বিনয়পিটক থেকে 'বিনয়বিভাষাশাস্ত্র' এবং অভিধম্মপিটক থেকে 'অভিধম্মবিভাষাশাস্ত্র' নামে তিনটি টীকা খোদিত হয়েছিল তামার পাতে। তামার সঙ্গে সঙ্গে সোনা রূপা পিতল কাঁসার উপরও খোদাইকর্ম মিলেছে—

যদিও তা অত্যন্ত অল্প। এ প্রসঙ্গে লোহার কথাও আসে। দিল্লিতে কুতুবমিনারের লৌহস্তম্ভের গায়ে কোনো এক রাজা চন্দ্রের লেখা খোদাই আছে যা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কাজ বলেই অনুমিত।

খোদাই হয় ছেনির সাহায্যে। প্রথম দিকে এই ছেনি ছিল শক্ত ধারালো পাথর। অনেক পরে তার স্থান নেয় লোহা। কিন্তু যখন তাল বা ভোজপাতা অথবা কাগজ কিংবা কাপড়ে লিখতে হত, তখন ব্যবহার করা হত মসী অর্থাৎ কালি। বেশ বড়ো ডুমুর বা পিপলগাছের ছাল থেতো করে ভিজিয়ে রাখা হত। কিছুদিন পরে সেই জল ফুটিয়ে কষ বের করে তার সঙ্গে সোহাগা ও লোধ্রা বোট মিশিয়ে নিয়ে দেখতে হত কাগজের ওপর লালরঙের রেখা ফুটে উঠছে কিনা। লাল রেখা ফুটে উঠলেই উনুন থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এই রঙিন তরলকে বলা হত আলতা। এরপর ওই আলতায় তিল তেলের বাতি থেকে পাওয়া কাজল মিশিয়ে তৈরি হত কালি। অপরপক্ষে কাজল খদির আর গঁদ জলে মিশিয়ে তৈরি হত এক ধরনের কাঁচা কালি। কিন্তু এ কালি হত না চিরস্থায়ী। আবার বাদাম খোসা গুঁড়ো করে গোমূত্রে ফেলে দীর্ঘসময় ঘুঁটেও তৈরি করা হত একধরনের কালি। বুলার সাহেব এই কালিকে পাকা কালি বলেছেন। আরো অন্য রকমের কালিও ছিল। পূর্বের আলতা থেকে এবং হিঙ্গুল ঘুটে লাল কালি তৈরি হত। এছাড়াও নানা বর্ণের শুকনো রং গঁদের সঙ্গে গুলে তৈরি হত। এছাড়াও নানা বর্ণের শুকনো রং গঁদের সঙ্গে গুলে তৈরি হত বিভিন্ন রঙিন কালি।

খড়ি বা কাঠের সূচালো কলম যেমন কাঠের পাটায় কলম হিশেবে চলত তেমনি কালির সাহায্যে লিখতে ছিল নল বা বাঁশকঞ্চির লেখনী। কালিতে ডুবিয়ে এ কলমে লেখা চলত। অজন্তা ইলোরাতে সম্ভবত ব্যবহার করা হয়েছিল তুলি। কিন্তু দক্ষিণভারতে তালপাতার উপরে দাবিয়ে লিখতে ব্যবহৃত হত লোহার শলাকা। এ প্রসঙ্গে বলি, ‘লিখ’ ধাতুর মূল অর্থ জোরে চাপ দিয়ে রেখা কাটা। দক্ষিণ ভারতে অক্ষরগুলি সূচমুখ লোহার শলাকার জন্যি গোলগোল আকারের। পাতার ওপর সূচালো লোহার খাড়া বা আড়াআড়ি রেখা কাটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ‘লিপ’ ধাতুর অর্থ লেপন করা বা রং লাগানো। বলা বাহুল্য, পাতার ওপর বাঁশ বা নলের কলম টানে কালির লেপন। তাই বর্ণ বা লিপির সঙ্গে লিখন শব্দটির সুক্ষ্ম দূরত্ব থাকে— এটুকু মনে রাখতে হবে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি

ড. পরিমল মণ্ডল

সংক্ষিপ্তসার : গুরুকুল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল গুরুর পরিবার বা গুরুর বংশ, কিন্তু ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ছিল একটি প্রাচীন এবং মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা যা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। গুরুকুলগুলিতে, ছাত্রদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জ্ঞানের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার্থীদের চিন্তনশীলতা, নৈতিকতা এবং সমাজসেবার গুরুত্বও শেখানো হত। বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ : গুরুকুল, উপনয়ন, নতুন শিক্ষানীতি

বিশ্বসংসারের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ। প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল পদ্ধতির উৎপত্তি বেদের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। বেদের রচনা কবে হয়েছিল এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্য নানা মতভেদ রয়েছে। পণ্ডিতরা কিছু মূল্যায়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে বেদের সময়কাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে মনে করেন। তবে কিছু পণ্ডিত তারও আগে বেদ রচিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ঋগ্বেদকে প্রাচীনতম বেদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার রচনাকাল প্রায় ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মনে করা হয়। বেদের বিষয় এতটাই উচ্চমানের যে, পরবর্তীকালে সকলেই বেদকে প্রামাণ্য রেখেই গ্রন্থ রচনা করেছে। বেদের সমৃদ্ধ ভাষা দেখে আমরা বলতে

পারি যে, বৈদিককালে একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তার জন্যই এইধরনেরর উচ্চকোটির গ্রন্থরচনা সম্ভব হয়েছে।

উদ্দেশ্য— গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থাটি বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। সেই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আধ্যাত্মিক জাগরণ, প্রকৃতি ও সমাজের প্রতি সচেতনতা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রেরণা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং জীবনে শৃঙ্খলা ইত্যাদি।

শিক্ষার কাঠামো— বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত দুই ধরনের পরিকাঠামা ছিল। প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা। প্রারম্ভিক শিক্ষা সেইসময় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিবারে সন্তান উৎপন্ন হওয়ার পরে বাল্যাবস্থার সংস্কার অর্থাৎ জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ ইত্যাদি সংস্কার দ্বারা সন্তানকে ভালো গুণ দেওয়া হত এবং পাঁচ বছরে বয়সে বিদ্যারম্ভ করানো হত।[১] এই সংস্কারের মাধ্যমে সন্তানকে অক্ষর লেখন এবং বাচন করানো হত। বিদ্যারম্ভ সংস্কার থেকে জ্ঞানের জগতে বালকের যাত্রা প্রারম্ভ হয়। তারপরে আট বছর বয়স থেকে শুরু করে বারো বছর বয়সের মধ্যে সন্তানকে উচ্চশিক্ষার জন্য উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে গুরুকুলে শিক্ষা অর্জন করার জন্য পাঠানো হত।[২] উপনয়ন সংস্কার বালকের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে করা হত। উপনয়ন সংস্কারের পরেই বেদারম্ভ সংস্কারের মাধ্যমে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করানো হত। শিক্ষা সমাপ্ত হলে সমাবর্তন সংস্কারের মধ্য দিয়ে গুরু বিদায় জানাতেন তারপরে তাঁরা যোগ্যতা অনুসারে কাজে যোগ দিতেন। ব্রহ্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হলে রাজা বা ক্ষত্রিয়, কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্যে পারদর্শী হলে বৈশ্য এবং উপরোক্ত কোনো বিদ্যা অর্জন না করতে পারলে তাহলে তিনি সমাজের সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হতেন, তাকেই শূদ্র বলা হত।

প্রধান বৈশিষ্ট্য— বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় রাজ্য অথবা দেশের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকত না। সেইসময় শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গুরুর নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। বৈদিককালীন শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক ছিল। এমনকি শিষ্যের আবাস এবং আহারের ব্যবস্থা গুরু স্বয়ং করতেন। অর্থের ব্যবস্থা সমাজের ধনী মানুষদের দান, শিষ্যের ভিক্ষা এবং গুরুদক্ষিণার মাধ্যমে সম্পন্ন হত। স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবার জন্য সমান শিক্ষাপদ্ধতি ছিল কারণ

সেইসময় মনে করা হত জন্ম থেকে সবাই শূদ্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করতেন।[৩] শিক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্বাচিত হত। গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে— 'চাতুর্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'।[৪]

প্রবেশপ্রক্রিয়া— গুরুকুলে প্রবেশের জন্য আট বছর, এগারো বছর এবং বারো বছর ছিল। গুরু বালকের বুদ্ধি অনুসারে ভালো বুদ্ধি থাকলে আট বছর বয়সে, একটু কম বুদ্ধি থাকলে এগারো বছরে এবং তারচেয়ে কম বুদ্ধি থাকলে বারো বছরে প্রবেশের সুযোগ পেত। বারো বছরের মধ্যেও গুরুকুলে প্রবেশের জন্য যোগ্য না হলে কোনো বালককে আর উচ্চশিক্ষার জন্য সুযোগ দেওয়া হত না, সেই বালককে শূদ্র বলে গণ্য করা হত।

পাঠ্যক্রম— প্রারম্ভিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র ইত্যাদির সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হত ভালো গুরুকুলে প্রবেশর জন্য। এবং তার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা এবং নীতিশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। নীতিশিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের নীতিমূলক গল্প শোনানো হত। গুরুকুলে প্রবেশের পরে পরা এবং অপরা বিদ্যার অধ্যয়ন করানো হত। মুণ্ডক উপনিষদ অনুসারে দুই প্রকারের বিদ্যা মানা হয়। পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যার অন্তর্গত বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ বেদ বেদাঙ্গ, এবং উপনিষদ) ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হত এবং অপরা বিদ্যার অন্তর্গত ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, ভূগর্ভশাস্ত্র, ভৌতিকশাস্ত্র ইত্যাদি লৌকিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।[৫] উত্তর-বৈদিককালে পাঠ্যক্রমের মধ্যে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্দশ প্রকার বিদ্যার বর্ণনা করেছেন—

পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।।[৬]

শিক্ষণপ্রবিধি— প্রাচীনকালে আধুনিককালের মতো মুদ্রণযন্ত্রের অভাবের কারণে শিক্ষণপ্রবিধি মৌখিক ছিল। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন শিক্ষণবিধির প্রয়োগ করা হত। শ্রবণ শিক্ষণবিধির মাধ্যমে ছাত্র বেদাদি গ্রন্থ ধ্যানপূর্বক শ্রবণ করে কণ্ঠস্থ করত। তারপরে মননের দ্বারা সেই কণ্ঠস্থ বিষয়টি একান্তে উপবেশন করে চিন্তন অথবা বিশ্লেষণ করত। বিশ্লেষণ করার পরে যে জ্ঞান অর্জন করতেন সেটিকে নিজের মস্তিষ্কে নিদিধ্যাসনের

মাধ্যমে গ্রহণ করতেন। এছাড়াও শিক্ষণবিধির অন্তর্গত প্রবচন, ব্যাখ্যান, শাস্ত্রার্থ, বাদ-বিবাদ ইত্যাদি বিধির প্রয়োগ করা হত।

পরীক্ষাপদ্ধতি— শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর শিষ্য পণ্ডিতদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের করা প্রশ্নের উত্তরে গুরু সন্তুষ্ট হলে তারপরে তিনি উত্তীর্ণ হতেন। গুরুর কাছে মৌখিক পরীক্ষা দিত।

সমাবর্তন— সম্পূর্ণ শিক্ষণকার্য সম্পন্ন হওয়ার পরে বিদ্যার্থীর সমাবর্তন সংস্কার অনুষ্ঠিত হত। এই সংস্কার গুরু নির্দেশে করা হত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে স্নাতক, বসু, রূদ্র, আদিত্য ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হত। বর্তমানকালের কনভোকেশন অথবা সমাবর্তন, বৈদিক সমাবর্তন এর আধুনিক রূপ।

প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র— প্রাচীন ভারতে বর্তমানকালের মতো শিক্ষণসংস্থা ছিল না। তক্ষশিলা, নালন্দা, মিথিলা, কাশী, প্রয়াগ, বিক্রমপুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর-বৈদিককালের শিক্ষাকেন্দ্র। এই সমস্ত কেন্দ্রের উৎপত্তি বৌদ্ধযুগে হয়েছে। বৈদিককালে টোল, চরণ, ঘটিকা, গুরুকুল, পরিষদ, মন্দির ইত্যাদি শিক্ষণসংস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমরা বলতে পারি যে বৈদিক শিক্ষাপদ্ধতি তৎকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্তমানকালে প্রয়োগ করতে গেলে কিছু পরিমার্জন অবশ্যই দরকার। বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক, আশ্রমিক শিক্ষা, অনুশাসিত জীবন, নিঃশুল্ক শিক্ষার ভাবনাকে গ্রহণ করতে পারি। বর্তমান শিক্ষানীতি ২০২০-কে সফল করতে গেলে বৈদিক শিক্ষাকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সূত্র নির্দেশ :

১. প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যারম্ভং তু কারয়েৎ । সংস্কাররত্নমালা পৃষ্ঠা ১০৭

২. অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ । ১ । গর্ভাষ্টমে বা । ২ । একাদশে ক্ষত্রিয়ম্ । ৩ । দ্বাদশে বৈশ্যম্ । ৪। উপনয়নপ্রকরণম্ পৃষ্ঠা ৬৩

৩. জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে । স্কন্দপুরাণ ৬.১.২৩৯.৩১

৪. ভগবদ্গীতা ৪/১৩

৫. তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং। নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।। মুণ্ডকোপনিষদ ১।১।৫

৬. যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১/১/৩

গ্রন্থঋণ :

১. পি বি কাণে, ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস, প্রথম বাগ, হিন্দী সমিতি, উত্তরপ্রদেশ ২০০০

২. ঝা. সুরেন্দ্র, প্রাচীনশিক্ষাপদ্ধতি, আশুতোষ প্রকাশন, লখনৌ, ২০০৪

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রসাদ, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ২০১৫

৪. মিশ্র সুবিমল, ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ আ ক খ প্রকাশনী, ২০০২

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৯

৬. ঘোষ রণজিৎ, আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ, সোমা বুক এজেন্সী, ২০০৬-২০০৮

৭. জে এস. বালিয়া, ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাস, অহমপাল প্রকাশনী, মেরঠ, ২০০৯

৮. শুক্লা. সি. এস, উদীয়মান ভারতীয় সমাজের শিক্ষক, ইন্টারন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস, মেরঠ, ২০০৮

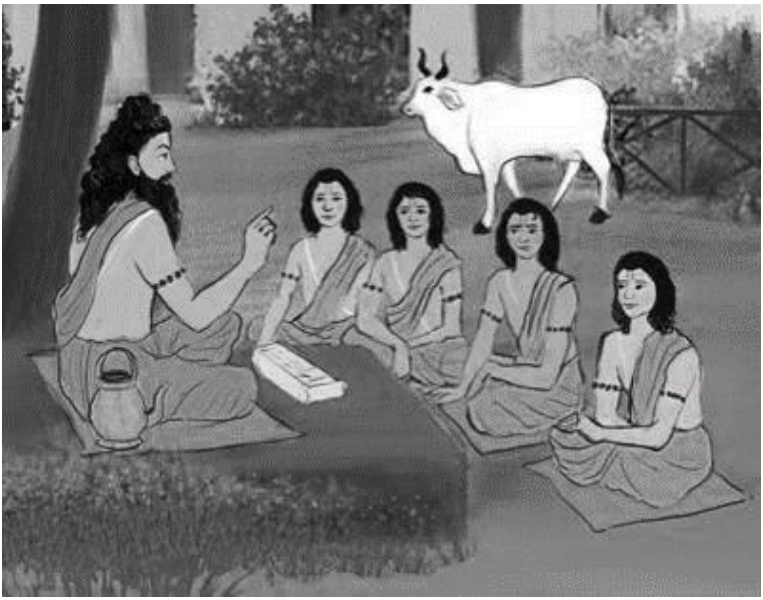
বৈদিক থেকে আধুনিক ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় শিক্ষাপদ্ধতির দৃষ্টান্ত পরিবর্তন

কাবেরী মণ্ডল ও বর্ষা মণ্ডল

ভূমিকা : শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত এটি চলতে থাকে। শিক্ষা প্রক্রিয়া মূলত চারটি উপাদানের সঙ্গে জড়িত, যথা— শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর এই পাঠক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতি। আর এই শিক্ষণপদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। একটি ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থা হল শিক্ষার একটা প্রথাগত রূপ, যেখানে তার মূল উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আধুনিক যুগ বা বর্তমান যুগের শিক্ষার মূল ভিত্তি হল প্রাচীন যুগের শিক্ষা। একদম প্রাচীন বা বৈদিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। সমাজে যত পরিবর্তন এসেছে, মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটেছে, উন্নত হয়েছে শিক্ষণপদ্ধতি। এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে আজ আমরা আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছি। যেসব উন্নত প্রযুক্তি ও নতুন শিক্ষণপদ্ধতি আমরা দেখছি তা সব কিছুই সেই প্রাচীন যুগের শিক্ষণপদ্ধতির রূপান্তর (ঘোষ, ১৯৯২) (ভক্তা ও ভক্তা, ২০১৮)।

১. বৈদিক যুগের শিক্ষণ পদ্ধতি— বৈদিক যুগের শেষে অর্থাৎ প্রান্তীয় বৈদিক যুগে বেদকে কেন্দ্র করে আর এক শিক্ষাব্যবস্থা জন্মলাভ করে, যা ইতিহাসে প্রান্তীয় শিক্ষা বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তিলাভ বা মোক্ষলাভ (ঘোষ, ১৯৯২)। প্রাচীন ঋষিদের কাছে শিক্ষা হল অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উত্তরণ এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি (ঘোষ, ১৯৯২)। এছাড়াও এই শিক্ষাব্যবস্থার

অন্যান্য লক্ষ্যগুলি হল— জীবন উপযোগী শিক্ষাদান, ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, সামাজিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন, চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ, বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতার বিকাশ, মানবিক সম্পর্কের উন্নতি, নৈতিক বিকাশ ও ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদান (ঘোষ, ১৯৯২)।

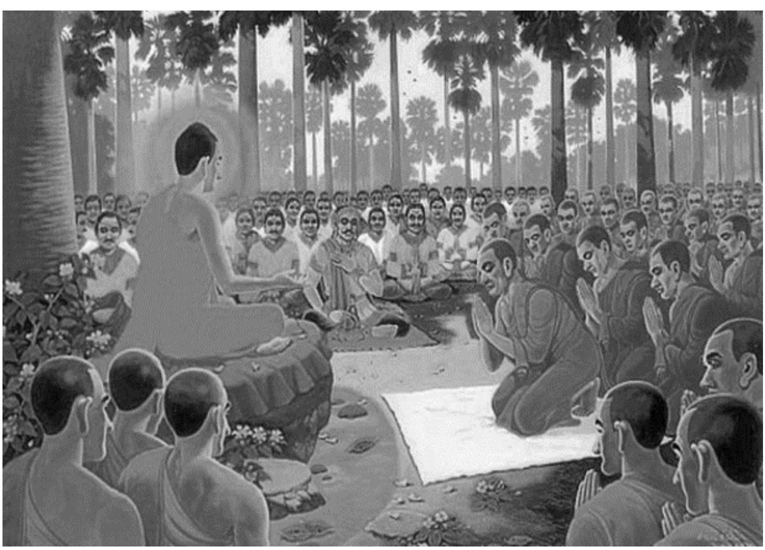


শিক্ষণপদ্ধতি— ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষণপদ্ধতি ছিল প্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রয়োজনে দলগত শিক্ষাদান হলে গুরু সমস্ত শিষ্যের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। পাঠদান পদ্ধতির কতগুলি স্তর ছিল (ভক্তা ও ভক্তা, ২০১৮)।

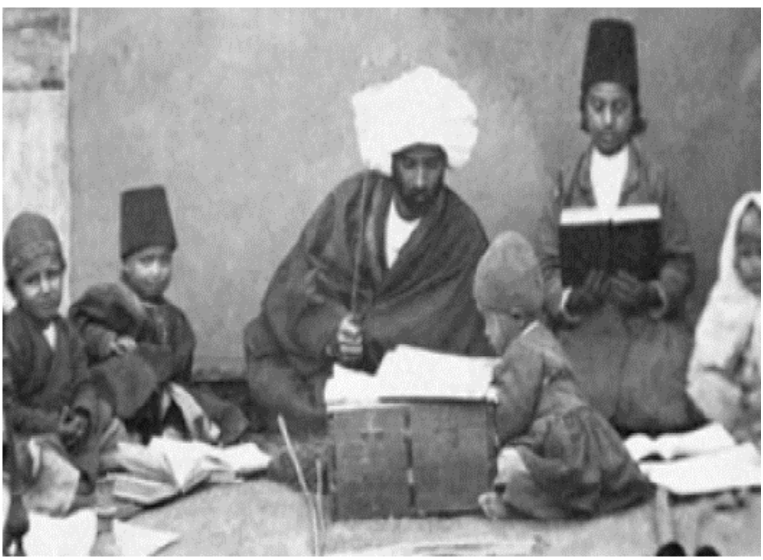
- প্রথম স্তরটি হল উপক্রম— এই পর্যায়ে শিষ্য গুরুর কাছ থেকে জানার আগ্রহ প্রকাশ করত (ঘোষ, ১৯৯২) (ভক্তা ও ভক্তা, ২০১৮)।
- দ্বিতীয় স্তরটি হল শ্রবণ— গুরু যে শ্লোকগুলি উচ্চারণ করত, শিষ্যরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। (ঘোষ, ১৯৯২)
- তৃতীয় স্তরটি হল আবৃত্তি— শিষ্যরা গুরুর থেকে যা শুনত তা বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে আয়ত্ত করত (ভক্তা ও ভক্তা,২০১৮)।
- এর পরের স্তরটি হল উপপতি— এখানে শিষ্য যুক্তির সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানকে দৃঢ় করত।

- পরের স্তরটি হল মনন— এর অর্থ জ্ঞান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। এবং
- সর্বশেষ স্তরটি হল নিদিধ্যাসন— একাগ্র মানে ধ্যানের মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি কারা।
- এছাড়া প্রশ্নোত্তর ও গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু ছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা ও পুত্রের মতো (ঘোষ, ১৯৯২) (ভক্তা ও ভক্তা, ২০১৮)।

২. বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিখনপদ্ধতি— বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা একটি অনুষ্ঠানের পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করত, যার নাম হল প্রবজ্জা। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় লিপির ব্যবহার ছিল কম। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল মৌখিক। গল্পের মাধ্যমে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হত। শিক্ষণপদ্ধতিতে তর্ক, আলোচনা ও সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচার হত। ব্যক্তিগত শিক্ষণ ছাড়াও শ্রেণিশিক্ষার প্রচলন ছিল। প্রয়োজন বোধে দুই প্রকার পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাদান করা হত। শিখনপদ্ধতিতে বিভিন্ন স্তর ছিল। যেমন- আবৃত্তিমূলক, আলোচনামূলক, শিক্ষামূলক এককভাবে তত্ত্বানু-স্মরণমূলক। মোটের উপর বলা যায় যে, শিখনপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক (ঘোষ, ১৯৯২) (ভক্তা ও ভক্তা, ২০১৮)।



৩. মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষণ পদ্ধতি– মুসলিম শিক্ষা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। মোহাম্মদের নীতি অনুসরণ, ইসলাম ধর্মের প্রচার, ইসলামীয় সামাজিক নীতিবাদের প্রচার ও বৈষয়িক উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাদ্রাসাগুলিতে ইসলাম ধর্মের নীতি, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস পড়ানো হত। মক্তব ও মাদ্রাসার প্রধানত শিখনপদ্ধতি ছিল মৌখিক। সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে লেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংশোধনী ও আরোহী পদ্ধতি বিশেষভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। ধর্ম, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও রাজনীতি প্রভৃতি পঠন-পাঠনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। এছাড়া মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মপঠন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ছাত্ররা একা, কোনো কোনো সময় শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই পড়াশোনা করত। (ঘোষ, ১৯৯২) (ভক্তা ও ভক্তা, ২০১৮)।



বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিক্ষণপদ্ধতি– ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার পরিবর্তন ঘটছে। তাই এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিখনপদ্ধতিগুলিরও পরিবর্তন ঘটেছে যথাসময়ে। অনেক কমিশন, কমিটির প্রতিবেদন ও আবেদন এবং বিভিন্ন মনোবিদদের মতাদর্শ মেনে শিখনপদ্ধতিগুলিকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে চলেছে। এরই সূত্র ধরে বর্তমান যুগের শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার পাঠদান পদ্ধতিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে সেগুলি সম্পর্কে বর্ণনা করা হল—

ক. বক্তৃতা পদ্ধতি
খ. প্রদর্শন পদ্ধতি
গ. দলগত পাঠদান
ঘ. সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠদান

ক. বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)– শিক্ষাব্যবস্থায় বহুল প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতি হল বক্তৃতা পদ্ধতি। সরল এবং নমনীয় প্রকৃতির জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এখানে একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে একসঙ্গে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি বিষয় শেখানোর সুযোগ পায়। কোনো কোর্স বা অধ্যয়নের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারে। এই পদ্ধতিকে জ্ঞানান্তর পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। যেখানে শিক্ষক তার নিজের জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানপ্রদান করে থাকে।



খ. প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method) - বক্তৃতা পদ্ধতিতে যেমন তাত্ত্বিক জ্ঞানগুলি প্রদান করা হয় এখানে এই তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হয়। এই বর্তমান শিখনপদ্ধতির মধ্যে সবথেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রথমে তাত্ত্বিক বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে এবং কী কী করতে হবে, কোন পদ্ধতির পর কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং এটির ফলাফল কী হবে তাও ব্যাখ্যা করে। পরবর্তীকালে প্রথমে তিনি নিজে প্রয়োগ করেন তারপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রয়োগ করান। এর ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞানও পেয়ে থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তথ্য, তত্ত্ব এবং ধারণাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এই পদ্ধতির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন রসায়ন শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন পরীক্ষাগুলি করা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে থাকে।



গ. দলগত পাঠদান (Team Teaching)-- দলগত পাঠদান পদ্ধতিটি ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। সহজ কথায় বলতে গেলে দলগত পাঠদান হল এমন এক ধরনের পদ্ধতি যেখানে দুই বা তার অধিক শিক্ষকরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের সমগ্র কোর্সের বিভিন্ন অংশের উপর পাঠদান করে থাকেন। যেমন— বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিত এসব বিষয়গুলি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী। এই পদ্ধতিটি খুব নমনীয় প্রকৃতির হওয়ার জন্য শিক্ষকেরা খুব অনায়াসে এটিকে গ্রহণ

করতে পারে এখানে যে পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় সেগুলি হল— অ্যাসাইনমেন্ট, সিডিউলিং ও গ্রুপিং। এখানে শুধুমাত্র শিক্ষকদের সহযোগিতা থাকলেই হবে না, শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষা অনুরাগীগণ সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দলগত পাঠদানটি সফল করে তোলা যাবে। দলগত পাঠদানের ফলে সময় যেমন সাশ্রয় হয় ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীদের দিকে যথেষ্ট নজরও দেওয়া যায়।



ঘ. সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠদান (Activity Based Instruction)— বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিখনপদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠদান। এই পদ্ধতি মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এটিকে Learning by doing বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মনোবিদ এই সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠদানের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন John Dewey, Paulo Freire। সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠদানের সাহায্যে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকে, ঠিক তেমনি শিখন আনন্দদায়ক ও দীর্ঘমেয়াদি হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের কল্পনাশক্তিকে অনেক গুণ কাজে লাগায়।



উপসংহার— উপরি-উক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে বর্তমান যুগে শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল শিশুকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ শিশুর চাহিদা-আগ্রহ-প্রবণতা-পছন্দ-প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা। আর এই বিকাশসাধনের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সবরকম শিক্ষাদান করা হত একথা যেমন ঠিক, তেমনি শিক্ষার্থীর আগ্রহ চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, যে সমস্ত শিক্ষার্থীর ধনুর্বিদ্যার প্রতি আগ্রহ ছিল তাদেরকে ধনুর শিক্ষা এবং যারা খেলার সময় বা অন্যসময় শারীরিক বল প্রয়োগ করত, তাদের গদার শিক্ষা বা কুস্তি শিক্ষা দেওয়া হত। ঠিক এরকম ভাবে ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে কোনো একটি বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার ব্যবস্থা ছিল।

এছাড়াও আমরা শিখনপদ্ধতিতে খেলার ছলে শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি। অত্যাধিক প্রযুক্তির ফলে শিশুরা এখন অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছে তাই তাদের এই ভাব কাটানোর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যদি খেলাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তারা অনেকটাই বহির্মুখী হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে সহযোগিতা সহমর্মিতা ও সহানুভূতির মতো নৈতিক গুণাবলীরও বিকাশ সাধন ঘটবে যা বর্তমান যুগে প্রায় লোপ

পেতে চলেছে। প্রাচীন যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা দেখেছি যে, সেখানে শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু না দেখে তাদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারত এবং ভবিষ্যতে তা খুবই স্বচ্ছন্দে পুনরুদ্রেকও করতে পারত। অর্থাৎ তাদের ধারণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এই বিষয়টি থেকে অনেকগুণ পিছিয়ে, তাই শিক্ষাক্ষেত্রে যদি ধ্যানযোগ এইরকম বিভিন্ন বিষয়কে শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তার বৌদ্ধিক স্বাস্থ্যও খুব ভালোভাবে বিকশিত হবে। যা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিকাশে এবং অহেতুক ভয়-দুশ্চিন্তা প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

- ড. দেবাশিস পাল, ‘শিখন ও মনোবিদ্যা’, রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪-১৫
- ভক্তিভূষণ ভক্তা, চন্দন ভক্তা, ‘ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা’, অ আ ক খ প্রকাশনী, পূর্ব মেদিনীপুর, নতুন সংস্করণ, ২০১৮
- রণজিৎ ঘোষ, ‘আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ’, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৮-২০২০
- সুশীল রায়, ‘শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন’, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, পরিমার্জিত চতুর্বিংশ সংস্করণ, ২০১৯-২০২০
- ছবি— ইন্টারনেট

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি সংস্কৃত ভাষা

সুপর্ণা মণ্ডল

সংক্ষিপ্তসার : সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই ভাষাই আমাদের পরিচয় ও উন্নতির ভিত্তি। সংস্কৃত ভাষা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা জ্ঞান ঐতিহ্যের নিরন্তর প্রবাহ। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা হল এই সংস্কৃত ভাষা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই ভাষার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদের কাল পর্যন্ত এ ভাষা বৈদিক ভাষা নামে পরিচিত। পরে লোকমুখে প্রচলিত ভাষা লৌকিক সংস্কৃত বলে অভিহিত হয়। এই লৌকিক সংস্কৃত ভাষাই ধ্রুপদি সংস্কৃত নামে পরিচিত। কাল ও বিষয়গত দিক থেকে এ ভাষার দুটি স্তর— বৈদিক ও লৌকিক। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা নামেও এর খ্যাতি রয়েছে। এ ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই, তবে দেবনাগরী বর্ণমালায় বিশেষভাবে গৃহীত।

প্রথম দিকে ভৌগোলিক সীমা অনুসারে সংস্কৃত ভাষাচর্চার স্থান ছিল ভারতের উত্তর অংশ কালক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে এমন কি প্রতিবেশী দেশগুলোতেও। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও উৎসসন্ধানে সংস্কৃত একান্ত প্রয়োজনীয় একটি ভাষা।

কাব্য, নাটকসহ সাহিত্যের সকল শাখা সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলিত হয়েছে – ধর্ম, ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, তুলনামূলক ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হলে সংস্কৃতচর্চা একান্ত আবশ্যক। সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষার যুগ বিভাগ করলে দেখা যায় চারটি বিভাগ বেদ মহাকাব্য পুরাণ ও ধ্রুপদি যুগ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে সমগ্র বেদের। যজ্ঞকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ কে কর্মকাণ্ড ও উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। বৈদিক যুগের সূত্রসাহিত্য ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনযাত্রার আকর গ্রন্থ।

তৎপরবর্তী রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতাত্মার বাণী আর মহাভারত হল ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি। গীতা হল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের বিশিষ্ট গ্রন্থ। এছাড়াও ধর্মদর্শন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস জানার জন্য পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। এরপরে ধ্রুপদি সাহিত্যের যুগ আজও প্রবাহমান। তবে বর্তমান সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা আধুনিক সংস্কৃতি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। কালে কালে চর্চিত এই ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ভারতের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, নৃত্যকলা, সংগীত, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্থাপত্যশৈলী এদের সম্মিলিত রূপই হল ভারতীয় সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতির মাতা হল সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার।

সূচক শব্দ : সংস্কৃতি, ভাষা, বেদ, রামায়ণ, সভ্যতা, মহাভারত।

সংস্কৃত এবং সংস্কৃতি (ভারতীয় সংস্কৃতি) আমাদের মহান জাতি ভারতের ভিত্তি। এটি ভারতের নৈতিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে কারণ সংস্কৃতে সংশ্লেষণ, সম্প্রীতি এবং পুনর্মিলন হল সংস্কৃতির সারাংশ। আমাদের শুধু ভাষা শিখতে হবে না, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও শিল্পকলা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন জ্ঞানক্ষেত্রের ভাণ্ডার শেখা, আত্মীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রচার করা আমাদের কর্তব্য। সংস্কৃতের বার্তা হল মানবতাবাদ, মানবজাতির ঐক্য, মূল্যবোধ, শান্তি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।

অয়ং নিজ পরোবতি, গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানাম্, তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীনতম প্রামাণ্য রচনা হল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্য থেকে শেষভাগের মধ্যবর্তী সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়কার কোনো লিখিত নথি পাওয়া যায় না। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গ্রন্থের মৌখিক প্রচলনটি বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, এই জাতীয় গ্রন্থগুলির সঠিক উচ্চারণকে ধর্মীয় কারণেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। ঋগ্বেদ থেকে পাণিনি (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার বিকাশ লক্ষিত হয় সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ এসব গ্রন্থগুলিতে। এই সময় থেকে এই ভাষার মর্যাদা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, এবং এর সঠিক উচ্চারণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি এই ভাষার বিবর্তনের পথে বাধা

হয়ে দাঁড়ায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী প্রাচীনতম সংস্কৃত ব্যাকরণ, যা আজও বর্তমান রয়েছে। এটি মূলত একটি প্রামাণ্য ব্যাকরণ। এটি বর্ণনামূলক নয়, নির্দেশমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ। যদিও পাণিনির সময় বেদের কয়েকটি অপ্রচলিত হয়ে পড়া বাক্যবন্ধের বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

'সংস্কৃত' শব্দটির দ্বারা অন্যান্য ভাষা থেকে পৃথক একটি ভাষাকে বোঝাত না, বরং বোঝাত একটি পরিমার্জিত কথনরীতিকে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত উচ্চসমাজে স্থান পাওয়া যেত। সাধারণত উচ্চবর্ণের মধ্যেই পাণিনির ব্যাকরণ তথা সংস্কৃত ভাষার চর্চা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ছিল বিদ্যাচর্চার ভাষা। লোকসাধারণে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও সমাজে প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য কথ্য প্রাকৃত ভাষা থেকেই পরবর্তীকালের আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়। বাংলা অঞ্চলে কখন থেকে সংস্কৃতের চর্চা শুরু হয় তা বলা কঠিন, তবে এর ইতিহাস অনেক প্রাচীন। গুপ্তযুগে আনুমানিক ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি লেখমালা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে এখানে সংস্কৃতচর্চার একটি পরিপূর্ণ চিত্র লক্ষ করা যায়। বাঙালি পণ্ডিতদের সৃষ্ট রচনারীতি আলঙ্কারিকদের নিকট গৌড়ী বা গৌড়ীয় রীতি নামে পরিচিত ছিল। পাল ও সেনযুগে সংস্কৃতচর্চার বেশ প্রসার ঘটেছিল। মুসলিম শাসনের শুরুতে সংস্কৃতচর্চার ধারা কিছুটা ব্যাহত হলেও পরবর্তী সময়ে ব্যাপক চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষত নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে ন্যায়ের চর্চা স্মরণীয়। পনেরো থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত নব্যন্যায়ের চর্চায় বঙ্গদেশ ছিল বিখ্যাত। আঠারো ও উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনামলে সংস্কৃতচর্চায় নবজাগরণ ঘটে। বিংশ শতকের শেষদিকে সংস্কৃতচর্চার গতি ক্ষীয়মাণ হলেও অদ্যাবধি সচল রয়েছে।

সংস্কৃতচর্চার ধারা :

পাল রাজারা (৭৫০-১১৬১) ছিলেন বৌদ্ধ। তবে তাঁদের সময়ে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চর্চা হয়। ভট্টনারায়ণের (খ্রি. ৯ম শতকের পূর্ববর্তী) বেণীসংহার, বিশাখদত্তের (৯ম শতকের পূর্ববর্তী) মুদ্রারাক্ষস, অভিনন্দের (৯ম শতক) রামচরিত, মুরারির (৯ম-১০ম শতক) অনর্ঘরাঘব, নোয়াখালী নিবাসী মৎস্যেন্দ্রনাথের (১০ম শতকের প্রথমভাগ) কৌলজ্ঞাননির্ণয়, বিক্রমপুরনিবাসী অতীশ দীপঙ্করের (৯৮০-১০৫৩) বোধিমার্গপঞ্জিকা, বোধিপথপ্রদীপ, গঙ্গাদাসের (১০ম-১১শ শতক)

ছন্দোমঞ্জরী, দিবাকরচন্দ্রের (১০ম-১১শ শতক) হেরুকসাধন, চক্রপাণি দত্তের (১১শ শতক) চিকিৎসাসারসংগ্রহ, নীতিবর্মার (১১শ শতক) কীচকবধ, সন্ধ্যাকার নন্দীর (আনু. ১০৮৪-১১৫৫) রামচরিত, সুরেশ্বরের (১১শ-১২শ শতক) শব্দপ্রদীপ, বৃক্ষায়ুর্বেদ, বিদ্যাকরের (আনু. ১২শ শতক) সুভাষিতরত্নকোষ এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সেন রাজারা (১০৯৭-১২৬০) ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। এ সময়ে হিন্দুধর্মসহ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়। অনেকের মতে এযুগ ছিল বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চার স্বর্ণযুগ। বল্লালসেন (১১৫৯-১১৮৫) ও লক্ষ্মণসেন (১১৮৫-১২০৬) উভয়ই ছিলেন বিদ্বান ও সাহিত্যানুরাগী। লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শরণ নামে পাঁচজন ছিলেন সংস্কৃত কবি। বল্লালসেন দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, আচারসাগর ও ব্রতসাগর গ্রন্থগুলি রচনা করেন। এছাড়া ভবদেবভট্টের (১১শ-১২শ শতক) ব্যবহারতিলক, কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ; শ্রীহর্ষের (১২শ শতক) নৈষধচরিত, গোবর্ধনাচার্যের আর্যাসপ্তশতী, ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, শ্রীধরদাসের (১২শ শতক) সদুক্তিকর্ণামৃত; হলায়ুধ মিশ্রের ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, পন্ডিতসর্বস্ব; পুরুষোত্তমদেবের (১২শ শতক) ভাষাবৃত্তি, হারাবলী; শরণদেবের (১২শ শতক) দুর্ঘটবৃত্তি ইত্যাদি উলে-খযোগ্য গ্রন্থ। কালিকাপুরাণ (১০ম-১১শ শতক), বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ (১১শ-১৪শ শতক) এবং দেবীভাগবতও (১২শ-১৩শ) এ সময়ের রচনা।

মুসলিম যুগে (১২০৬-১৭৫৭) সংস্কৃতের উলেখযোগ্য চর্চা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাসহ কাব্য, নাটক, দর্শন ইত্যাদির প্রতিটি শাখায় প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়। প্রধান গ্রন্থসমূহ বৈষ্ণব কবিদের রচনা। বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল— রূপ গোস্বামীর (আনু. ১৪৭০-১৫৫৯) পদ্যাবলী, হরিনামামৃতব্যাকরণ, উজ্জ্বলনীলমণি; মুরারি গুপ্তের (১৫শ-১৬শ শতক) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, সনাতন গোস্বামীর (আনু. ১৪৬৫-১৫৫৫) বৈষ্ণবতোষিণী; রঘুনাথ দাসের (আনু. ১৪৯০-১৫৭৭) দানকেলিচিন্তামণি; বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চাননের (১৫শ-১৬শ শতক) কোষকাব্য সূক্তিমুক্তাবলী, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) ভ্রমরদূত, পিকদূত; জীব গোস্বামীর (আনু. ১৫১৪-১৬০৯) ষট্সন্দর্ভ; কবিকর্ণপূরের (১৫২৫-?) চৈতন্যচরিতামৃত,

চৈতন্যচন্দ্রোদয় (নাটক), গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (দর্শন), অলঙ্কারকৌস্তভ; চন্দ্রশেখর (১৬শ-১৭শ শতক) ও গোবিন্দ ভট্টাচার্যের (১৭শ শতক) দুটি ঐতিহাসিক কাব্য শূর্জনচরিত ও পদ্যমুক্তাবলী; ভুলুয়ার (বর্তমান নোয়াখালী) রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের (১৬শ-১৭শ শতক) নাটক বিখ্যাতবিজয়, তাঁর পুত্র অমরমাণিক্যের নাটক বৈকুণ্ঠবিজয়, চন্দ্রমাণিক্যের কাব্য অপদেশশতক, লক্ষ্মণমাণিক্যের সভাকবি রঘুনাথ কবিতার্কিকের প্রহসন কৌতুকরত্নাকর; কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ও তাঁর স্ত্রী বৈজয়ন্তীর (১৭শ শতক) আনন্দলতিকাচম্পূ, প্রিয়ম্বদার (১৭শ শতক) শ্যামারহস্য; বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর (১৭শ শতক) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত; শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ শতক) পদাঙ্কদূত ইত্যাদি।

নব্যস্মৃতি চর্চায় উলেখযোগ্য জীমূতবাহনের (আনু.১০৫০-১১৫০) দায়ভাগ; শূলপাণির (আনু. ১৩৭৫-১৪৬০) প্রায়শ্চিত্তবিবেক; কুলুভট্টের (১৫শ শতক) স্মৃতিসাগর; শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির (১৫শ-১৬শ শতক) কৃত্যতত্ত্বার্ণব; রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের (১৫শ-১৬শ শতক) অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, দায়ভাগটীকা ইত্যাদি। এ গ্রন্থগুলি তখন হিন্দুসমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, কোনো কোনোটি বর্তমানেও ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়।

দর্শনে উল্লেখযোগ্য বাসুদেব সার্বভৌমের (আনু.১৪৩০-১৫৪০) অনুমাণপরীক্ষা, রঘুনাথ শিরোমণির (১৫শ-১৬শ শতক) প্রত্যক্ষমণিদীধিতি, অনুমানদীধিতি; রামভদ্র সার্বভৌমের (১৬শ শতক) ন্যায়রহস্য; রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের (১৬শ শতক) মীমাংসারত্ন, গোপালগঞ্জের (বৃহত্তর ফরিদপুর) কোটালীপাড়ানিবাসী মধুসূদন সরস্বতীর (১৫২৫-১৬৩২) অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্তকল্পলতিকা, অদ্বৈতমঞ্জরী; বিজ্ঞানভিক্ষুর (১৬শ-১৭ শতক) বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ইত্যাদি।

ব্যাকরণে বোপদেবের (১৩শ শতক) মুগ্ধবোধ, ক্রমদীশ্বরের (১৫শ শতক) সংক্ষিপ্তসার, পুন্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের (১৫শ-১৬শ শতক) কাতন্ত্রপ্রদীপ প্রভৃতি উলেখযোগ্য গ্রন্থ। অভিধানে চট্টগ্রাম নিবাসী জটাধরের (১৫শ শতক) অভিধানতন্ত্র, বৃহস্পতি রায়মুকুটের (১৫শ শতক) পদচন্দ্রিকা, ভরত মলিকের (১৭শ শতক) একবর্ণার্থসংগ্রহ, দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ; রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির (১৭শ শতক) ত্রিকান্ডবিবেক ইত্যাদি উলেখযোগ্য। অলঙ্কার ও ছন্দে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের (১৭শ-১৮শ শতক) কাব্যবিলাস ও বৃত্তরত্নাবলী; তন্ত্রে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের (১৬শ শতক) তন্ত্রসার, ব্রহ্মানন্দ গিরির

(১৬শ শতক) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, নেত্রকোনা জেলার পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকের (১৬শ শতক) শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী ইত্যাদি উল্লেখ-যোগ্য।

ব্রিটিশ যুগে (১৭৫৭-১৯৪৭) বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি সংস্কৃত চর্চায়ও এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। মৌলিক গ্রন্থ রচনা কম হলেও অনুবাদসহ সংস্কৃত পঠন-পাঠনে একটা গতি পরিলক্ষিত হয়।

সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের নাম প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত। এছাড়া এসময়ে পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী, গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এবং পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীতে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা হয়। সনাতন পদ্ধতিতে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্রসমূহ টোল নামে পরিচিত। বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশে তখন অসংখ্য টোল ছিল এবং প্রত্যেক টোলে ছাত্রসংখ্যাও ছিল প্রচুর।

নব্যন্যায় চর্চার ন্যায় নব্যস্মৃতি চর্চায়ও বাঙালির অবদান অবিস্মরণীয়। এ সময় স্মৃতিগ্রন্থ রচনায় অনেকে উলেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখেন। ত্রিবেণীনিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৭৯৪-১৮০৭) স্যার উইলিয়ম জোনসের (১৭৪৬-১৭৯৪) উৎসাহে বিবাদভঙ্গার্ণব নামে একখানা সুবিশাল স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭) এ গ্রন্থের অংশবিশেষ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, যা পরবর্তীকালে Colebroke's Digest নামে পরিচিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু আইন সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসায় গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হয়েছিল।

বিবাদার্ণবসেতু অপর একটি বিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহগ্রন্থ। এর সংকলয়িতা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭০০-১৭৮৮) ছিলেন হুগলি জেলার গুপ্তপল্লীর বিখ্যাত শোভাকরের বংশধর। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে আরো দশজন বাঙালি পণ্ডিতের সহায়তায় বিবাদার্ণবসেতু সংকলন করেন। এ গ্রন্থটিও হিন্দু আইন সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসায় খুবই সহায়ক হয়েছিল। গ্রন্থটি প্রথমে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। ফারসি থেকে হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০) এর ইংরেজি অনুবাদ করেন (A Code of Gentoo Law, London, 1776)।

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৫৪-১৯১৭) নব্যস্মৃতিশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। উদ্ধারচন্দ্রিকা তাঁর মৌলিক গ্রন্থ। তৎকালে সমুদ্র পার হয়ে যাঁরা পাশ্চাত্য দেশে যেতেন, তাঁদের পুনরায় সমাজভুক্ত করার বিষয়টি এতে আলোচিত হয়েছে। কাশীচন্দ্র মনুসংহিতাসহ কুড়িটি ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

ময়মনসিংহের শেরপুরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (১৮৩৬-১৯১০) নব্যস্মৃতি বিষয়ে বেশকিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উদ্বাহচন্দ্রালোক বাংলার পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। তাঁর আরো দুটি গ্রন্থের নাম শুদ্ধিচন্দ্রালোক ও ঔর্ধ্বদেহিকচন্দ্রালোক। এছাড়া তিনি ব্যাকরণ, কাব্য এবং নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর ব্যাকরণগ্রন্থের নাম কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সংস্কৃত চর্চায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৬-১৯৬১)। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার উনশিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। হরিদাসের রচিত স্মৃতিগ্রন্থ স্মৃতিচিন্তামণি। নব্যস্মৃতির এ গ্রন্থে হিন্দুদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিধি-বিধান বঙ্গানুবাদসহ স্থান পেয়েছে।

নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতি চর্চায় আরো কিছু উল্লেখযোগ্য নাম হল কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ (১৮শ শতক), গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন (১৮০৬-১৮৫৫), হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১৮২৯-১৮৮৯), মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১৮৩৩-১৯১১), নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (১৮৪৩-১৯৩৬), ভট্টপল্লীর কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (১৮৭০-১৯৩৪) প্রমুখ। কৃষ্ণকান্তের ন্যায়রত্নাবলী, তর্কামৃততরঙ্গিণী; কৃষ্ণনাথের ন্যায়প্রকাশ, বেদান্তপরিভাষাটীকা, অর্থসংগ্রহ (মীমাংসা), তত্ত্বকৌমুদী (সাংখ্য); কামাখ্যানাথের সাংখ্যদীপনী, ন্যায়তত্ত্ববোধিনী, ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকা; কমলকৃষ্ণের সম্পাদিত দানক্রিয়াকৌমুদী, কৃত্য-রত্নাকর, রাজধর্মকৌস্তভ প্রভৃতি গ্রন্থ ন্যায় ও স্মৃতিচর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেশীয় অনেক রাজা ও জমিদার সংস্কৃতচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, নাটোরের রাজা রামকান্ত ও রানী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মলরাজ গোপাল সিংহ, ঢাকার রাজনগরের রাজবল্লভ সেন প্রমুখ। কৃষ্ণচন্দ্র রায় নদীয়াসহ সমগ্র বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতচর্চায় অর্থ দান করেছেন। এ সময়ের বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টে বঙ্গদেশে সংস্কৃত টোল, চতুষ্পাঠী ও কলেজে সংস্কৃতচর্চার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেসব রিপোর্টের মধ্যে উলেখযোগ্য দুটি হল— উইলিয়ম অ্যাডাম রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) এবং রেভারেন্ড জেমস লং রিপোর্ট (১৮৬৮)। এগুলি থেকে সমগ্র বাংলায় সংস্কৃতচর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্কৃত ভাষার চর্চা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) মাধ্যমে। এখানে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হত। অল্পকালের মধ্যে কোলব্রুক প্রমুখ পণ্ডিত ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। প্রকাশিত হয় মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্তকৌমুদী, অমরকোষ এবং উইলসনের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান। দেশীয় আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, মনুসংহিতা, দত্তকচন্দ্রিকা, দায়ক্রমসংগ্রহ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণ ও আইনের পাশাপাশি সাহিত্যগ্রন্থ নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, রামায়ণ, গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়, হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত, নলোদয় প্রভৃতিও প্রকাশিত হয়। ১৮০৫ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ সকল গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বহুল উপকার সাধিত হয়েছিল। অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকেরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অবগত হন।

সংস্কৃত কলেজ ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের নির্দেশে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজ। সংস্কৃত চর্চায় এ কলেজের অবদান অপরিসীম। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন ও আধুনিক ধারার সমন্বয়ে সংস্কৃতকে সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। অতীতে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানদেরই শিক্ষার অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রথমে কায়স্থ সন্তানগণ এবং পরে সকল হিন্দু ভদ্র সন্তানই পড়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি যেমন বাংলা

শিশুপাঠ রচনা করেছেন, তেমনি সংস্কৃতে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সহজবোধ্য সংস্কৃত পুস্তকও প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত ঋজুপাঠ শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। দুর্বোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজবোধ্য করার জন্য তিনি রচনা করেন উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী। তিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, সর্বদর্শনসংগ্রহ, উত্তররামচরিত, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচ্ছন্ন বঙ্গানুবাদ করে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যকে সর্বসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলেন। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি টোল-চতুষ্পাঠীর সংস্কার সাধন এবং সংস্কৃতে উপাধি পরীক্ষার প্রচলন করেন। ১৮৭৯ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রথম উপাধি পরীক্ষা হয়। অবশ্য এর এক বছর আগে থেকেই ঢাকার সারস্বত সমাজে এ পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৮৪ থেকে পূর্বতন ‘বিদ্যাবিনোদ’ ইত্যাদি উপাধি বাদ দিয়ে ‘তীর্থ’ উপাধি (যেমন কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সংস্কৃত কলেজের অনেক অধ্যাপক এবং ছাত্রও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়গোপাল তর্করত্ন (১৭৭৫-১৮৪৬), ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮০৫-১৮৬৭), জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮০৬-১৮৭২), তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১১-১৮৮৫), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪) প্রমুখ।

জয়গোপাল তর্করত্নের জন্ম যশোর জেলার বজরপুরে। তিনি শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক রচনা করেন। এতে ১১৯টি শ্লোক এবং একই সঙ্গে পয়ার ছন্দে তার বাংলা অনুবাদ আছে। শিক্ষাসার নামক অপর একটি গ্রন্থে তিনি সংযোজন করেছেন গুরুদক্ষিণা, চাণক্যশ্লোক এবং শুভঙ্করকৃত আর্যা। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত মহাভারতের তিনি একজন পরিশোধক ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত স্মার্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত। দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা,

স্মৃতিচন্দ্রিকা, চতুর্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি তাঁর উলেখযোগ্য স্মৃতিগ্রন্থ। তিনি প্রথমে ল'পরীক্ষা কমিটির পণ্ডিত এবং পরে বর্ধমানের জজপণ্ডিত ছিলেন।

অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের দর্শন ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে পারতেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে রঘুবংশের টীকা, নৈষধচরিত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, কুমারসম্ভব, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের শিক্ষক। শঙ্করবিজয় ও পদার্থতত্ত্বসার তাঁর প্রণীত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। আত্মতত্ত্ববিবেক, কণাদসূত্রবৃত্তি, সর্বদর্শনসংগ্রহ, ন্যায়দর্শন, ভৈরবপঞ্চাশিকা প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তকৌমুদী ও বৈয়াকরণভূষণসারসহ বিভিন্ন ব্যাকরণগ্রন্থ; কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গদ্যকাব্য; কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি মহাকাব্য এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীরচরিত, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী, বেণীসংহার প্রভৃতি নাটক টীকা ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদনা করেন। শব্দার্থরত্ন, গয়ামাহাত্ম্য, তুলাদানপদ্ধতি প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তাঁর অনন্যসাধারণ কীর্তি শব্দস্তোমমহানিধি এবং বাচস্পত্যাভিধান নামক দুটি অভিধান। কলেজের অধ্যাপনা শেষ করে তিনি নিজগৃহে অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বহু ছাত্রকে বিদ্যা দান করেন।

নদীয়ার বিল্বগ্রামনিবাসী মদনমোহন তর্কালঙ্কার আত্মতত্ত্ববিবেক, কবিকল্পদ্রুম, খন্ডনখন্ডখাদ্য, বাসবদত্তা, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যাখ্যাবিশেষণসহ সম্পাদনা করেন। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ। চবিবশ পরগনা জেলার ভাটপাড়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশুদ্ধানন্দচরিত, কোকিলদূত, রাসরসোদয়, পূর্বমীমাংসার্থ সংগৃহীতটীকা প্রভৃতি।

বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ধর্মবিচার হয় এবং তা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গায়ত্র্যাঃ পরমোপাসনাবিধানম্ এবং আত্মানাত্মবিবেক তাঁর

রচিত দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ। বেদান্ত ও উপনিষদ অবলম্বনে তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, ঈশোপনিষৎ, তলবকারোপনিষৎ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, বজ্রসূচী, গীতার পদ্যানুবাদ ইত্যাদি তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ। তিনি ব্রাহ্মসমাজে বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে বেদপাঠের ব্যবস্থা করেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর বহু বছরের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম। এর মাধ্যমে বিশেষত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে এদেশের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সহজ হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সংস্কৃত চর্চার প্রসারে অনেক অধ্যাপক ও ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করেছেন। উপনিষদের প্রচারে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে উপনিষদের সুন্দর শ্লোকসমূহকে সুবিন্যস্ত করেন এবং নিজের সন্তান ও বাড়ির বধূদেরও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মহর্ষির প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) অল্প বয়সে মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন। গীতার ওপর তিনি গীতাপাঠ নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) গীতা ও মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন। বৌদ্ধসংস্কৃতেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সতেরোটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃতজ্ঞান সুবিদিত। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা এবং কালিদাস, ভবভূতি ও বাণভট্টের রচনাবলি তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি অন্যদেরও সংস্কৃতপাঠে উৎসাহিত করেছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও ছাত্রদের জন্য পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে অবশ্যপাঠ্য করেছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি নিজে সংস্কৃতপাঠঃ নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত করেন: 'অথেয়ং বিশ্বভারতী, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্...।' সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তাঁকে 'কবি সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করেছেন, যার অনেকগুলি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বন্দনামূলক। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর অনেক চিঠিপত্রও আছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ হয়েও সংস্কৃত ভাষার প্রসারে যত্নবান ছিলেন। বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফান্ড ও বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী তাঁর দানে পরিচালিত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে 'অধিভারতী' নামে জননীরূপে বন্দনা করেছেন। তাঁর একটি স্তোত্রের মধ্যে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের বীজ। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত জ্ঞানও সুবিদিত; তাঁর কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব এবং গীতার অনুবাদে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) গভীরভাবে সংস্কৃত অনুশীলন করেন। তিনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং হিন্দুশাস্ত্র সম্পাদনা করেন। পদার্থবিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং প্রণয়ন করেন যজ্ঞকথা। এছাড়া তিনি ঐতরেয়ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ করেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) চণ্ডী ও গীতার পদ্যানুবাদ করেন। সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণে তিনি রচনা করেন রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে কাব্যত্রয়।

পুরাতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, অগ্নিপুরাণ, গোপথ ব্রাহ্মণসহ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) সংস্কৃত মহাভারতের মূলানুগ বঙ্গানুবাদ করেন, যা খুবই বিশ্বস্ততা অর্জন করে। তিনি গীতা, বিক্রমোর্বশীয় ও মালতীমাধবও অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বেণীসংহারের অনুবাদ নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সংস্কৃত ও সভ্যতা :

সংস্কৃতকে প্রায়শই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার আত্মা হিসাবে উল্লেখ করা হয় বিভিন্ন কারণে। প্রথমত, এটি বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে পদ্ধতিগত ভাষাগুলির মধ্যে একটি, একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে ধর্মীয় গ্রন্থ, দার্শনিক গ্রন্থ, কবিতা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাহিত্য এর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত ভারতের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থের ভাষা হিসেবে কাজ করে। তদুপরি, সংস্কৃত ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি, কারণ এটি ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ও

অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রভাব ভাষা ও সাহিত্যের বাইরে ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। অধিকন্তু, সংস্কৃতের ব্যাকরণ এবং কাঠামো শুধুমাত্র ভারতে নয়, বিশ্বের অন্যান্য অংশেও ভাষাগত এবং ব্যাকরণগত তত্ত্বগুলির বিকাশের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূক্ষ্মতা এবং জটিলতা একটি শ্রদ্ধেয় এবং প্রভাবশালী ভাষা হিসাবে এর মর্যাদায় অবদান রেখেছে। সামগ্রিকভাবে, ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণে সংস্কৃতের ভূমিকা, বিভিন্ন শৈল্পিক ও পণ্ডিত সাধনার উপর এর প্রভাব, এবং ভাষাগত ও ব্যাকরণগত অধ্যয়নে এর অবদান ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আত্মা হিসেবে এর খ্যাতিতে অবদান রাখে।

সংস্কৃত শুধুমাত্র ভারতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষা নয়, ভারতের আত্মা বেদ, পুরাণ এবং উপনিষদের মধ্যে রয়েছে। ভারতের চিন্তাভাবনা বোঝার জন্য ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন আবশ্যক। বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, নাট্যশাস্ত্র, দর্শন, কামসূত্র, অষ্টাধ্যায়ী ইত্যাদি ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অনন্য গ্রন্থ। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হাজার হাজার বছর ধরে বিদ্যমান। সংস্কৃত ভাষা ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার প্রাণ। এটি বিশ্বের অন্যান্য ভাষার তুলনায় শুধু শুদ্ধ ও সমৃদ্ধই নয় বরং তাদের থেকেও বেশি পরিমার্জিত। এই ভাষা যত বেশি বোধগম্য এবং সরল, তত বেশি সারমর্ম এতে রয়েছে। বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে প্রাচীনতম এই ভাষাটি সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী। সংস্কৃত শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য ঐশ্বরিক বার্তার একটি বাহন। আজ সংস্কৃতের বাণী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে জাতীয় ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ। এই ভাষা বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন, ভাষা ও সাহিত্য লালন-পালনের জন্য একটি বিশেষ ভিত্তি প্রদান করেছে। , সংস্কৃত ভাষা, তার মর্যাদাপূর্ণ অভিব্যক্তি সহ, ভারতীয় চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

'ভারতস্য প্রতিষ্ঠে দ্বে সংস্কৃতম্ সংস্কৃতিস্তথা', অর্থাৎ ভারতের প্রতিপত্তিতে সংস্কৃতের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশে একটা সময় ছিল যে সংস্কৃত ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শাস্ত্রীয় বোঝাপড়া, গণিত এবং চিকিৎসার ভাষা। এছাড়া সঙ্গীত ও সাহিত্যের বিভিন্ন শিল্পধারাও

সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বেদ হল ভারতের চিরন্তন কণ্ঠ, যা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতকে একটি জাতি হিসেবে অখণ্ড রেখেছে।

যে কোনো জাতিকে তার ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। জাতীয় ভাষাই এর শক্তি। ভাষা সমাজকে তার জাতির সাথে সংযুক্ত করে। ভাষার কারণে শুধু সংস্কৃতিই রক্ষিত হয় না, জাতির সঙ্গে এক অনন্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিজের ভাষার প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করে জাতির আত্মমর্যাদাবোধ। ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছে ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প ছিল এবং তারা সেই সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। আজ ইসরাইল বিশ্বের একটি শক্তিশালী ও সক্ষম জাতি হিসেবে আমাদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যদি ভারতের কথা চিন্তা করি, যে ভাষায় আমরা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস খুঁজে পাই তা হল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধতম সাহিত্য। এটি কেবল ভারতকে একত্রিত করতেই কাজ করে না, সমগ্র বিশ্বকে মানবতার শিক্ষা দেয়। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের আপনার এবং আমার অনুভূতি থেকে মুক্ত করে এবং বিশ্বকে একটি পরিবার হিসাবে বিবেচনা করে।

গ্রন্থসূচি :

১. ডা. পোখরিয়াল, রমেশ, ভারতীয় সংস্কৃতি সভ্যতা ও পরম্পরা, ডায়মণ্ড বুকস্, ২০২০
২. মিশ্র অমলেশ, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কি একটি মিশ্র সংস্কৃতি?, তুহিনা পাবলিকেশন, ২০১৪
৩. রঙ্গনাথানন্দ স্বামী, ভারতীয় সংস্কৃতি, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮
৪. বসু শবনম, ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি, আনন্দ প্রকাশন, ২০২৩
৫. অভেদানন্দ স্বামী, ভারত ও তাহার সংস্কৃতি, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ২০০২
৬. বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ইন্টারনেট
৭. উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট
৮. অরবিন্দ সোসাইটি, ইন্টারনেট

ধর্ম ও দর্শন : মানবিক অভিজ্ঞতার দুই পাখনা

সোমনাথ রায়, সুস্মিতা নস্কর

সংক্ষিপ্তসার : মানুষের ইতিহাস জুড়েই ধর্ম ও দর্শন দুইটি অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে এসেছে। এই লেখায় আমরা এই দুইয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক অন্বেষণ করব। আমরা দেখব, ধর্ম প্রশ্ন উত্থাপন করে, অর্থ খোঁজে এবং জীবনের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করে, আর দর্শন সেই প্রশ্নগুলোর যুক্তিযুক্ত ও গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তর খুঁজে পেতে চায়। ধর্ম আমাদেরকে বিশ্বাস, নীতিবোধ, এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এটি আমাদের মৃত্যুর মতো কঠিন বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে শেখায় এবং আমাদের জীবনে আশা ও উদ্দেশ্য প্রদান করে। অন্যদিকে, দর্শন আমাদেরকে সত্য, জ্ঞান, এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে। এটি আমাদেরকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে, যুক্তি ব্যবহার করতে এবং জীবনের গভীর অর্থ অনুসন্ধান করতে শেখায়। এই নিবন্ধে, আমরা ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল দেখব। আমরা দেখব যে, কীভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস দর্শনীয় চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, এবং কীভাবে দার্শনিক চিন্তা ধর্মীয় অনুশীলনকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। এছাড়া, আমরা এই দুইয়ের মধ্যে কিছু উদ্দেশ্যমূলক পার্থক্যও দেখব।

ধর্ম ও দর্শন মানবিক অভিজ্ঞতার দুটি অপরিহার্য পাখনা। তারা আমাদের জীবনের অর্থ, মূল্যবোধ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে এবং সার্থক জীবনযাপনে সাহায্য করে।

সূচক শব্দ : ধর্ম, দর্শন, মানবিক অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, যুক্তি, জ্ঞান, মূল্যবোধ।

ধর্ম ও দর্শন মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে থাকে। এই দুইয়ের মধ্যে সাম্য এবং পার্থক্য রয়েছে। ধর্ম অবশ্যই একটি বিশেষ কোনো মত না হলেও এটি মানুষের আদর্শ এবং নীতির সমষ্টি যা তার জীবনে নির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করে। ধর্ম মানবসমাজের মধ্যে সংগঠিত নৈতিক এবং ধার্মিক

আদর্শ উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে মানুষ তার আত্মস্বীকৃত মানবিক মূল্য এবং নৈতিক নীতিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্যদিকে, মানবদর্শন ধার্মিক এবং মেটাফিজিকাল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার একটি উপায় বলে ধরা হয়। এটি মানব মনোভাব, বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বব্যাপী বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়। এদের পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। ধর্ম এবং দর্শন দুটির মধ্যে তদারকি এবং অন্যদিকের সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক অনুভবের মাধ্যমে মানুষের জীবনে সামঞ্জস্য ও সংগঠন উন্নতি হতে পারে।

ধর্ম ও দর্শন মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক এবং মূল্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। ধর্ম মূলত একটি বিশেষ প্রকারের আচরণ, বিশ্বাস এবং মৌলিক অধিকারের সংস্কার। এটি মূলত মনুষ্যের সঙ্গে তার আদর্শ এবং বিশ্বাসের সংস্কারের মাধ্যমে জড়িত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে ধর্মীয় মূল্য ও নীতি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং আচরণের মাধ্যমে মানুষের ধার্মিক অভিজ্ঞতা নির্মিত হয়। দর্শন হল মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত বা মতামত। এটি মানুষের প্রশ্নোত্তর, বিচার এবং সমাধানের উপর ভিত্তি করে অত্যন্ত প্রভাবশালী হতে পারে। দর্শনে মানুষের জীবনের উপর তত্ত্ব ও নীতির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আলোচনা করা হয়। এটি বিশেষভাবে তত্ত্ব, নীতি, মনোবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন এবং মৌলিক বিশ্ববোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত। ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে ধর্ম হল একটি বিশেষ আচরণ, বিশ্বাস এবং মৌলিক অধিকারের সংস্কার, যা মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অবলম্বন করে। দর্শন হলো মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত, মত বা মতামত। এর মাধ্যমে মানুষ জীবনের বিভিন্ন দিক এবং মূল্যবোধ বোঝা, উন্নত করা এবং নির্দিষ্ট দিকে নির্দেশ করা হয়।

ধর্ম ও দর্শনের মধ্যস্থতা এবং তাদের মহত্ত্ব : ধর্ম ও দর্শন দুটি মানবীয় বিষয়, যা মানব সমাজের জীবনের নির্দিষ্ট দিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধর্ম সাধারণত মর্যাদায় ও নৈতিকতায় একটি সৃষ্টিতে মানব আদর্শ এবং নীতিবান্ধব জীবনের নির্দেশিকা প্রদান করে। আর দর্শন মানবের সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দর্শনাত্মক ও মৌলিক প্রশ্নবিদ্যার অনুসন্ধানের বিভিন্ন মাধ্যম ও উপায় যা তার বৈচিত্র্য, উচ্চতা ও নিয়োজিত নিবেদন করে। ধর্ম ও দর্শন একত্রে মানব বিচারের, আদর্শের, সংস্কৃতির

এবং সামাজিক নির্মাণের প্রধান মাধ্যম হিসাবে পরিচিত। এই দুটি অন্যত্র এবং সমতলে অসংখ্য প্রকারে মানবের মনোভাব, ধারাবাহিকতা ও সমাজের অভিধানে প্রভাব ফেলে।

মানব সমাজের চিন্তার উদ্দীপনা হিসেবে ধর্ম ও দর্শনের গুরুত্ব : ধর্ম ও দর্শন মানব সমাজের চিন্তার উদ্দীপনা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী অংশ। এটি মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রভাব ফেলে এবং সমাজের নিয়মানুযায়ী প্রগতি ও বিকাশের পথে প্রাথমিক উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্ম মানব সমাজের আধুনিক সমাজিক নিয়ম এবং মর্যাদায় নিয়ে আলোচনা করে এবং মানুষের চরিত্র এবং নৈতিকতার উন্নতি করে। ধর্ম মানব মতানৈতিকতার সঙ্গে মিলিত হয়। ন্যায়ের এবং মানবিক আদর্শের উদ্ধারণের জন্য একটি গাইড হিসেবে এটি পরিচিত। ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক সংঘর্ষের সময়ে মানবতার বৃদ্ধি এবং শান্তির প্রতীক্ষা সৃষ্টি করা হয়।

দর্শন মানব চিন্তার উত্থান ও প্রগতিশীল অংশ হিসেবে গণ্য হয়। দর্শনের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন দিকে চিন্তা করে, যা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নতির বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দর্শন মানবের মনোবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, ঐতিহাসিক উন্নতি, সংগঠনশীল চিন্তা, এবং মতামত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রকারে, ধর্ম ও দর্শন মানব সমাজের চিন্তার উদ্দীপনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের মধ্যে অভিভাবকতা রয়েছে যা মানব সমাজের উন্নতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারে অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

ধর্মের ভূমিকা :

ধর্মের পরিভাষা এবং তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য : ধর্মের পরিভাষা এবং তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নির্দেশ করে মানুষের ধার্মিক অবস্থার একটি মানক। ধর্ম বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের আধারে বিভিন্নভাবে পরিভাষিত হতে পারে, তবে ধর্মের সাধারণ পরিভাষা হল মানুষের জীবনে একটি মূল্যবান ও প্রধান ধারাবাহিক অবস্থা যা মানুষকে তার জীবনের উদ্দীপনা, নির্দেশনা এবং পরিপূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করে।

ধর্ম মানবকে অবশ্যই আদর্শ, নীতি এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাসবদ্ধ করে যাতে তিনি সমাজে সঠিকভাবে অবস্থান এবং সৎ ও উত্তম মর্যাদা অনুসরণ করতে পারেন। ধর্মের মাধ্যমে মানুষ আত্মবিশ্বাস, আদর্শ, সহিষ্ণুতা,

আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং পরহিত প্রবর্তনের প্রেরণা পায়। ধর্মের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানুষকে একটি উচ্চ নীতিমূলক ও আদর্শবাদী জীবন প্রণয়ন করার জন্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত করা। ধর্মের এই উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা সাধারণত বিভিন্ন ধর্মীয় সাহিত্য, শাস্ত্র এবং ধারাবাহিক ধর্মানুষ্ঠানে প্রকাশ পায়।

দর্শনের ভূমিকা :

দর্শন বা 'দর্শন' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় 'দেখা', 'বোঝা', 'জ্ঞান' ইত্যাদির অর্থে ব্যবহৃত হয়। দর্শন বা দার্শনিক পরিচয় করতে অবশ্যই তার সংস্কৃতি কতটা পরিপূর্ণ হল তা দর্শায় এবং এটি তার আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে দার্শনিক নিজের কাছে একটা উচ্চ অর্থ নিয়েছে বলে জানায়।

দর্শনের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মানুষের চিন্তার উন্নতি ও আত্মবিশ্বাসের অর্জন। এটি মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের পরিকল্পনা করার একটি নিয়োজিত মাধ্যম। দর্শনের মাধ্যমে মানুষ সমাজের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবধান প্রদান করে এবং নিজের জীবনের ধারাবাহিকতা ও মর্যাদা বজায় রাখতে পারে।

দর্শন মানব বিচারের, জ্ঞানের, নীতিবিদ্যা এবং মৌলিক প্রশ্নবিদ্যার অনুসন্ধানের বিভিন্ন মাধ্যম ও উপায় যা তার বৈচিত্র্য, উচ্চতা নির্ধারণ করে। এটি মানুষের হৃদয় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে নতুন ধারাবাহিকতা এবং নীতিবান্ধব ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং চিন্তাধারার মাধ্যমে দর্শন মানুষের জীবনে নতুন দিক ও মৌলিক বিশ্লেষণ সরবরাহ করে এবং মানব সমাজের নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর প্রভাব ফেলে। এটি সমাজের সাংঘাতিক অবস্থা, নিরাপত্তা এবং মানবিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও নীতিমূলক আলোচনা সৃষ্টি করে। দর্শনের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মানব বিচারের সুস্থ এবং উন্নত বিকাশ ও পরিমার্জনের মাধ্যম হিসাবে পরিচিত।

- **ধর্ম ও দর্শনের মধ্যস্থতা এবং তাদের সম্পর্কের পরিচিতি :**

ধর্ম এবং দর্শন দুটি মনোভাব ও ধারণার সাহায্যে মানুষের জীবনের মূল প্রশ্নগুলির প্রতি উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্ম মূলত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূলত নীতিবাচক পরিপ্রেক্ষিত দিকের ব্যাপারে কাজ করে, যেখানে দর্শন বিশ্লেষণ ও তত্ত্বের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সময় দর্শন বিভিন্ন বিষয়ে মতামত আবিষ্কার করে এবং মানবজনের বিভিন্ন প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হয়। সাম্য এবং পরিবর্তনের সূত্রে সম্পর্ক গড়ে তুলে।

- **দুটি ধারার মধ্যস্থতা এবং বৈশিষ্ট্য:**

ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে সাম্য এবং বৈশিষ্ট্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাম্যের দিকে, তারা সমানভাবে মানব জীবনের নিয়মানুযায়ী উপার্জন করা পরিকল্পনা করে। বৈশিষ্ট্যে, তারা প্রতিটি ধর্ম এবং দর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবান মৌলিক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। সাম্য এবং বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকে মৌলিক মূল্যের অনুসরণ করে এবং তাদের সম্পর্ককে একটি সুস্থ ও বিন্যাসিত পরিবেশে ধরে রেখে। এই সাম্য এবং বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে একটি উজ্জ্বল মিলনসার সৃষ্টি করে, যা মানুষের চিন্তার বিস্তৃতি এবং উন্নতি করে।

- **ধর্ম ও দর্শনের ভূমিকা এবং তাদের মানবিক প্রভাব:**

ধর্ম ও দর্শন সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধর্ম মানবদেহের পরিচয় ও উন্নত মনোভাবের গঠনে মহান ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষের জীবনের নীতি, আদর্শ, মূল্য, সংস্কৃতি এবং সমাজের আচরণের প্রতি প্রভাব ফেলে। দর্শন মানুষের মতামত, ধারণা এবং সৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষের চিন্তার বিকাশে মূল্যবান অবদান রাখে। ধর্ম ও দর্শনের মাধ্যমে মানুষ নিজের মনোভাব এবং পরিকল্পনা নির্ধারণ করে, তার জীবনে প্রয়োগ ঘটাউ এবং সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে।

- **মানব সমাজের অস্থিরতা এবং ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব:**

মানব সমাজ অস্থিরতা প্রদানকারী একটি ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক বাহ্যিকতা। ধর্ম ও দর্শন মানব সমাজের অস্থিরতার মূল কারণ হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবে মানব সমাজের মূল্য ও নীতির পরিবর্তন হতে পারে, যা মূলত নৈতিক এবং ধার্মিক ভিত্তিতে উপস্থিত থাকে। সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিকে অবনতি এবং উন্নতির দিকে প্রেরণা করতে পারে ধর্ম ও দর্শন। তবে, সমাজের অস্থিরতা এবং নিরাপত্তার সৃষ্টি বা বিনাশ নির্ভর করে মূলত সমাজের বিভিন্ন পার্থক্য এবং প্রবল ভাবে ধর্মগুলির প্রভাবে।

- **ধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ :**

ধর্ম ও দর্শন মানব জীবনের দুটি মৌলিক ও অভিন্ন অংশ। ধর্ম মানব জীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিকের উন্নতি ও প্রশান্তি সাধনের পথ প্রদর্শন করে। এটি মানুষের মধ্যে আদর্শ ও নীতির উদ্বেগ উৎপন্ন করে এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা এবং নৈতিক মূল্যায়নে সহায়তা

করে। দর্শন মানবচিন্তা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তার করে এবং মানুষের মনোভাব ও বিশ্বব্যাপী ধারাবাহিকতা তৈরি করে। এটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে প্রদান করে এবং তাদেরকে নৈতিক উন্নতি এবং আত্মবিশ্বাসের পথে প্রেরণা জোগায়। ধর্ম ও দর্শনের অবদান মানব সভ্যতা ও সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত— যা সমাজের সম্মান, সমন্বয় এবং প্রেরণা তৈরি করে।

• মানব সমাজে ধর্ম ও দর্শনের প্রয়োগ এবং তাদের প্রভাব :

ধর্ম ও দর্শন মানব সমাজের নির্ধারিত নীতিমালা, মূল্যবান ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। এদের প্রয়োগ মানব সমাজে নৈতিকতা, ধর্ম, মর্যাদা এবং সমাজের পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকে প্রভাব ফেলে। ধর্ম ও দর্শনের মাধ্যমে মানুষের বিচার এবং আচরণ নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের জীবনে সামাজিক, নৈতিক এবং ধার্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। ধর্ম ও দর্শনের মাধ্যমে মানব সমাজের মধ্যে সাম্য, সহযোগিতা, প্রেম, শান্তি এবং সহিষ্ণুতা প্রচার করে এবং বৈষম্য, আপত্তি এবং বিপর্যয় প্রতিরোধ সম্ভব করে তোলে। ধর্ম ও দর্শনের প্রয়োগ মানব সমাজের মধ্যে শান্তি, সমন্বয়, এবং সমৃদ্ধি বিকাশে সহায়ক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

- গান্ধী, মহাত্মা। 'যুদ্ধ ও শান্তি'। নির্দেশিকা প্রকাশন, ১৯৫৮।
- রাসেল, বার্ট্রান্ড। 'ইতিহাসের সংক্ষেপ'। রাউটলেজ, ১৯৫৪।
- রামানুজান, স্বামী বিবেকানন্দ। 'ধর্ম ও মানবতা'। উপদেশ প্রকাশন, ১৯১২।
- ডুভোইজ, মার্ক। 'বাইবেল'। সিমন এবং শুস্টার, ১৯৫২।
- কান্ট, ইমানুয়েল। 'প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক বক্তব্য'। স্যামুয়েল সেন, ১৭৭৬।
- অ্যালবার্ট, আলবার্ট। 'নতুন বিজ্ঞানের সংগঠন'। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৯।
- স্বামী বিবেকানন্দ। 'ধর্ম ও মানবতা'। উপদেশ প্রকাশন, ১৯১২।
- মাকসি, আন্ড্রু। 'ধর্ম ও মানব জীবনের অগ্রগতি'। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

পাশ্চাত্য নয় প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষা প্রদানের শুরু ভারতেই

প্রবীর দে

সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ (PEOPLE WITH SPECIAL NEED), আর তারমধ্যে ৮৫-৯০ শতাংশই রয়েছে অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিতে (WHO)। একজন সুস্থ মানুষের মতো প্রতিবন্ধীরও বুদ্ধিমত্তা আছে। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পেলে তাদের গভীর পাণ্ডিত্বের প্রকাশ ঘটে। সাধারণ মানুষকে পেছনে ফেলে নিজ কীর্তিগুণে প্রখর মেধাবী অনেক প্রতিবন্ধীরা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োগ যতদিন না সার্বিক প্রয়োগ ঘটছে, ততদিন শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে না। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথে শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ, গণমুখীকরণ এবং শিক্ষায় সমানাধিকারের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে মগ্ন সারা পৃথিবী। সমগ্র পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসা এবং পূর্ণ অধিকার নিয়ে তাঁদেরকে বাঁচতে শেখানোই সভ্য সমাজের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অক্ষমতাযুক্ত মানুষদের আগে বলা হত প্রতিবন্ধী (Handicap), তারপরে বলা হল প্রতিস্পর্ধী (challenged), কিছুদিন এদেরকে বলা হয়েছিল ব্যতিক্রমী সক্ষম (Exceptionally abled), আর বর্তমানে বলা হয়— বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ (People with special need)। এখন অবশ্য কারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের (PWSN) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সে সম্বন্ধে বর্তমানে সুনির্দিষ্ট আইন প্রচলিত (RPWDAct 2016)।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাধারণ মূলস্রোতের শিক্ষায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবার আধুনিক ও আদর্শ ব্যবস্থাপনার নাম হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রতিটি শিশুকেই সমাজে

সমানাধিকার দিতে এবং নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বাঁচার পথ দেখাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। একীভূত সমাজগঠনের অন্যতম কৌশলই হল অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা যার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে— প্রত্যেকের কাজের অধিকার, বিভাজন পেরিয়ে অন্যান্য সকল সমবয়সি শিশুদের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের এবং সাফল্য লাভের অধিকার। এজন্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগ ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সমস্ত দেশের বর্তমানকালের আবশ্যকীয় কার্যক্রম।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারণা স্বীকৃত সেই মত অনুযায়ী, প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষাদানের সূচনা হয়েছিল পাশ্চাত্যে। পাশ্চাত্যে মোটামুটিভাবে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুরু হয় পঞ্চদশ শতক থেকে। ইউরোপ ও আমেরিকার মহান শিক্ষাবিদ যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— পাউলাস বাগেল্লাদুস, মাদাম মারিয়া মন্টেসরী, ফ্রয়েবেল, রুশো, টমাস হবস, বেকন প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। তবে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাদানের শুরু অষ্টাদশ শতকে। ১৭৫৫ সালে প্যারিসে DE I PEE সর্বপ্রথম শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাবলিক স্কুল স্থাপন করেন। এইসময় থেকেই ইশারা ভাষা, লিপ রিডিং, আঙুলের সাহায্যে বানান পদ্ধতির সুচনা হয়। পাশ্চাত্যে বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838), Seguin(1855), ব্রেইল প্রমুখ। ১৮৫০ সালে সেগুইন আমেরিকায় নিউইয়র্ক, অহিও, পেনসিলভানিয়া প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধিক ও শারীরিক প্রতিস্পর্ধীদের বিশেষ আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একাধিক অক্ষমতায় আক্রান্তদের জন্যে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন Dr. Samuel.G.Hoa। (এই স্কুলেই (Perkins Institute for blind) হেলেন কিলার পরবর্তীকালে পড়াশুনা করেছিলেন)। বিষয় হল প্রতিস্পর্ধীদের বিশেষ শিক্ষাপ্রদানের পৃথক ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্যে; কিন্তু প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষাপ্রদানের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহনকারী দেশ হল ভারতবর্ষ। প্রতিবন্ধকতা থাকতেই পারে কিন্ত সাহচর্য ও নির্ভরতা প্রদান করতে পারলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হতে পারেন,তার স্বীয় সত্তারও স্বাধীন বিকাশ সম্ভব—- এই দর্শনের দ্রষ্টা ভারতবর্ষ। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয়রা প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার প্রামাণ্য ইতিহাস অনুসন্ধান করে যতই আমরা এই ধারণার উৎস হিসেবে পাশ্চাত্যকে কৃতিত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষা প্রবর্তনের ভারতীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এর শুরুর ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশ থেকেই। ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্যে বর্ণিত প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাপ্রদানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ইতিহাস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন নয়। মনে রাখতে হবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বেদ, পুরাণ, মহাকাব্যে বর্ণিত তথ্যের ভূমিকা অসামান্য। সমকালীন ঘটনা বা ইতিহাসের ছায়ায় রচিত এইসব প্রাচীন গ্রন্থে শুধু ভারতবর্ষের ধর্মসমাজ বা ঘরের কথা নেই; আছে মনুষ্যত্ব ও মুক্তিচেতনার মজ্জা, পরিণামমুখী মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা যা হাজার বছর পরে আজও প্রাসঙ্গিক, আগামী দিনেও উপযোগী। পুরাণ ও প্রাচীন মহাকাব্যকে আকাশকুসুম কল্পনাবিলাস ভ্রমে সেকেলে অচ্ছুৎ বলে দূরে সরিয়ে না রেখে যুক্তিবাদী মানবিক দৃষ্টিতে বিচারবিশ্লেষণ করা দরকার।

ভারতে প্রতিস্পর্ধী শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে দেশীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় দেশীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে বৈদিক যুগের সাহিত্য, মহাকাব্য, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, ষড়দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত সাহিত্য, জীবনচরিত, আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপাদান হিসেবে বৈদিক সাহিত্যের পর রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্যের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। সমকালীন সামাজিক অবস্থা জানার কাজে মহাকাব্য দুটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে খুবই সহায়তা করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'-র ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছিলেন— "... রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ... ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"

মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির মধ্যে কেউ শৌর্যে, কেউ প্রজ্ঞায়, কেউ দুর আচরণীয় তপস্যায় সিদ্ধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন; কেউবা দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। দৈহিক বিকৃতি প্রতিবন্ধীদের মনে বা কাজে কখনও কোনো ছাপ ফেলেনি, হীনমন্যতা বা পলায়নী মনোভাবের সৃষ্টি করেনি। সনাতনী সে সকল আখ্যান থেকে এটা জানা যায়

যে ভাববাদ, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিস্পর্ধীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন, ভারতীয় প্রাচীন এই ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা ধারণার জন্ম এবং যা কিনা আজ শুধু ভারতেই নয় সারা বিশ্বে প্রাসঙ্গিক এবং আইনানুগ।

গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগ সম্পর্কিত পদ্ধতির আরোপ শুরু হলেও প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা, সুযোগ প্রদান এবং নির্ভরতা প্রদান প্রভৃতির ইতিহাস কিন্তু দীর্ঘ দিনের। মনুসংহিতায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে পরিবারের প্রধান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিস্পর্ধী বা অক্ষম আত্মীয়দের দেখাশোনা করতে বাধ্য থাকবেন (মনুসংহিতা— Buhler, 1886, 372 পাতা)। মনুসংহিতায় আরো বলা আছে যে শারীরিক অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে রাজা কখনও কর গ্রহণ করতে পারবেন না। অর্থাৎ ভারতবর্ষে সহানুভূতিশীলতার ইতিহাস সুপ্রাচীন।

মহাকাব্যে বর্ণিত প্রতিস্পর্ধী অষ্টাবক্র মুনির কীর্তির কথা নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে (অষ্টাবক্র মহাকাব্য)। বাল্মীকির রামায়ণের বনপর্বে অষ্টাবক্র গীতা এবং ভবভূতি রচিত উত্তররামচরিত নাটকেও অষ্টাবক্রের জীবন বর্ণনা করা রয়েছে। অষ্টাবক্র প্রতিবন্ধী থাকাকালীন সকলের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছিলেন, ঋষি উদ্দালকের মতো শিক্ষক পেয়েছিলেন। অষ্টাবক্র মুনির জীবনের কাহিনি জানা আছে নিশ্চয়ই। ঋষি উদ্দালকের (ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই ঋষির উল্লেখ আছে) কাহোরা নামে একজন শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতাকে কাহোরার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। এরপর নববিবাহিত দম্পতি একটি বনের আশ্রমে বসবাস শুরু করে। সুজাতা কয়েক বছর পর গর্ভবতী হন। শিশুটি গর্ভে থাকা অবস্থায় একদিন কাহোলাকে বলে যে সে রাতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার সময় প্রতিটিতে আটটি ভুল করছে। রাগান্বিত হয়ে কাহোরা শিশুটিকে অভিশাপ দেন যে সে আটটি অঙ্গ (পা, হাঁটু, হাত, বুক এবং মাথা) বিকৃত হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এদিকে, অর্থের প্রয়োজনে সুজাতা কাহোরাকে মিথিলায় পাঠান রাজা জনকের কাছ থেকে কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য। জনকের একজন দরবারী বন্দী, কাহোরাকে শাস্ত্রার্থে (শাস্ত্রের অর্থের উপর মৌখিক দ্বন্দ্ব) পরাজিত করেন এবং বরুণপাশ ব্যবহার করে ঋষিকে জলের নীচে ডুবিয়ে দেন। উদ্দালক সুজাতাকে তার স্বামীর ভাগ্য সম্পর্কে

অবহিত করেন এবং ঘটনাটি তাঁর সন্তানের কাছ থেকে গোপন রাখতে বলেন।

সুজাতার গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুটির নাম উদ্দালক রাখেন অষ্টাবক্র। একই সময়ে উদ্দালকের একটি পুত্রের জন্ম হয় এবং তার নাম হয় শ্বেতকেতু। অষ্টবক্র এবং শ্বেতকেতু ভাইয়ের মতো বড়ো হন এবং উদ্দালকের কাছ থেকে শাস্ত্র শেখেন। অষ্টাবক্র মনে করেন উদ্দালক তাঁর পিতা এবং শ্বেতকেতু তাঁর ভাই। দশ বছর বয়সে, জানতে পারেন যে তাঁর প্রকৃত পিতা বন্দী কর্তৃক অবরুদ্ধ। তখন অষ্টাবক্র পিতাকে মুক্ত করতে মিথিলাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অষ্টাবক্র তার মামা শ্বেতকেতুর সঙ্গে মিথিলাতে গমন করেন এবং যথাক্রমে দ্বাররক্ষক, রাজা জনক ও বন্দীকে শাস্ত্রার্থে পরাজিত করেন এবং তারপর তার পিতা কাহোরার মুক্তি নিশ্চিত করেন। বাড়ি ফেরার পথে, কাহোলা অষ্টাবক্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করান এবং অষ্টাবক্র তার শরীরের আটটি বিকৃতি থেকে মুক্ত হন। শেষে, অষ্টাবক্র, ঋষি বশিষ্ঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সীতা ও রামের দরবারে উপস্থিত হন এবং অযোধ্যার সমাবেশে সম্মানিত হতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলেন। অষ্টাবক্র মুনির কাহিনি থেকে একথা জানা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রতিস্পর্ধীদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন।

ভারতীয় মহাকাব্য প্রতিবন্ধীদের প্রতি যে মর্যাদা দেখিয়েছে তার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত হল মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র। প্রথমে তিনি হয়তো অধিকার থাকা সত্ত্বেও রাজা রূপে নির্বাচিত হননি। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাণ্ডুর স্বেচ্ছানির্বাসনের পরে ভীষ্মের পরিচালনায় ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু মর্যাদার সঙ্গেই রাজত্ব করেছিলেন। রাজার শাসন করতে ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি, সমাজ সম্বন্ধে প্রজ্ঞা ও শিক্ষা প্রয়োজন, সে জ্ঞান তিনি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেকালে প্রতিবন্ধীদের সমাজের আর সকলের মতো করে বাঁচতে দেওয়ার জন্য সংকল্প ছিলই।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও, প্রতিস্পর্ধী বা অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি খারাপ ভাষাব্যবহার বা অমর্যাদাকর আচরণের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের আইনের অনুশাসন উল্লিখিত রয়েছে। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথক ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধধর্মও যে প্রতিবন্ধীদের সহানুভূতিশীল সেকথা ত্রিপিটকেই আছে। আর সম্রাট অশোক তো

প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে রাজ কোষাগারের অর্থে পৃথক হাসপাতালও তুলেছিলেন।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত প্রতিটি শিশুকে যদি তার সমানাধিকারের দাবিকে সুনিশ্চিত করতে হয় তবে প্রথম দরকার তাকে শিক্ষার আঙিনায় আনয়ন করা এবং তার শিক্ষাগ্রহণের নির্ভরতা প্রদান করা। এজন্য শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতি কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আমরা আলোকপ্রাপ্ত হই বিখ্যাত গ্রন্থ্ পঞ্চতন্ত্র থেকে। ভারতবর্ষে পৌরাণিক যুগে, পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মার দ্বারাই হয়তো সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধীদের (Intellectually disabled) শিক্ষাদানের চেষ্টা শুরু হয়।

পঞ্চতন্ত্র সৃষ্টির ইতিহাস আমরা প্রায় সবাই জানি। রাজা অমরশক্তি বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধী তিনপুত্র— বসুশক্তি, উগ্রশক্তি এবং অনেকশক্তিকে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ শিক্ষকের সন্ধানে ছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা এই বিষয়ে সহায়তা করতে পারেন সেই খোঁজ পেয়ে রাজা বিষ্ণুশর্মাকে দায়িত্ব অর্পণ করার ইচ্ছে পোষণ করেন। বিষ্ণু শর্মা প্রথমে রাজি হননি। পরে এক অসম্ভব সংলাপের কথা রাজাকে জানান যে, ছয় মাসের মধ্যে তিন রাজকুমারদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাবেন। ছয়মাস মাত্র সময় নিয়ে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন গল্পের ছলে, তারই নির্যাস হল পঞ্চতন্ত্র। রাজাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ছয়মাসের মধ্যেই সফলভাবে রাজপুত্রদের শিক্ষাদানে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন এই পঞ্চতন্ত্রের মাধ্যমে। সারা পৃথিবীর প্রায় সমগ্র ভাষাতেই এই গ্রন্থ্ অনূদিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বৌদ্ধিক প্রতিস্পর্ধীদের শিক্ষাদানের জন্য পঞ্চতন্ত্রর থেকে সেরা বই আজও পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি (philoshopher Besham, 1964)।

ভারতের স্বাধীনতার আগে, প্রতিবন্ধীদের জন্য সুস্পষ্ট আইন ছিল না একথা ঠিক। স্বাধীনতার পর থেকে, প্রতিবন্ধীদের অধিকারের জন্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, হয়তো এখনও সম্পূর্ণরূপে সমস্যাটি মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতেও প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় চালু হয় ইংরেজ শাসনকালে। প্রথম শুরু হয় বেনারসে ১৮৫৪ সালে। সে বিদ্যালয় ছিল বিশেষ বিদ্যালয় (special school), শুধু প্রতিবন্ধীদের জন্যেই। ১৮৮৪ সালে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশন তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সির মাজাগাঁওয়ে বধিরদের জন্য প্রথম স্কুল শুরু

করে। ১৮৯৩ সালে দ্য ক্যালকাটা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পরবর্তীকালে ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ ভারতের পালায়মকোট্টায় বধিরদের জন্য একটি স্কুল চালু হয়। ওদিকে ১৮৮৭ সালে অমৃতসরে অন্ধদের জন্য প্রথম স্কুল চালু হয়। বিশেষ বিদ্যালয়ে স্থাপন করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার সংগঠিত প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে।

১৯৭৪ সালে IEDC (Integrated Education for Disabled Children) Scheme গ্রহণ করা হয় যদিও তা চালু হয় ১৯৮৭ সালে। এতে তিনটি কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল—- প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যার আঙিনায় 'প্রবেশ, সমতা এবং সুযোগ'। ১৯৯২ সালে RCI (The Rehabilitation Council Of India) আইন গঠিত হয় মূলত প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষার বিভিন্ন কোর্সগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। স্বাধীনতার পরে অন্তর্ভুক্তি শিক্ষায় বহু বিবর্তনের পরে বিষয়টিকে আইনানুগ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৫ সালে ভারতে PWD ACT (People with diabily) চালু হয়। ২০০৭ সালে ভারত UNCRPD-তে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করার পরে, UNCRPD-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য ২০১০ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইন, ১৯৯৫-এর (PWD আইন, 1995) জায়গায় একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ধারাবাহিক আলোচনা সভা এবং খসড়া প্রক্রিয়ার পর PWD আইন, ২০১৬ (RPWD আইন, 2016) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ দ্বারা পাশ হয় ।

RPWD আইন, ২০১৬ তে বলা হয়েছে যে "যথাযথভাবে সরকার নিশ্চিত করবে যে PWD রা সমতার অধিকার (equality), মর্যাদার সাথে জীবন (life with dignity) এবং অন্যদের সাথে সমানভাবে তার নিজের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান উপভোগ করবে (respect for his/her integrity equally with others)।" এই আইনে আরো বলা হয়েছে যে সরকার যেন উপযুক্ত পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে PWD-এর ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ধারা 3-এ বলা হয়েছে যে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনো PWD-কে বৈষম্য করা হবে না, এবং কোনো ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না শুধুমাত্র অক্ষমতার ভিত্তিতে। পিডব্লিউডিদের জন্য সম্প্রদায়ে বসবাস নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারী ও প্রতিবন্ধী

শিশুরা অন্যদের সমান অধিকার ভোগ নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতবর্ষে প্রতিস্পর্ধী শিক্ষার যেহেতু প্রাচীন ইতিহাস আছে তাই অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষার সর্বাত্মক প্রয়োগ শুধু সময়ের অপেক্ষা। হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলির প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হিন্দুরা হয়তো বিশ্বাস করে যে অক্ষমতা নেতিবাচক কর্মের কারণে হয়, তবে এটি বাইরের শাস্তিমূলক শক্তি বা ঈশ্বর দ্বারা আরোপিত হয় না। হিন্দুধর্ম বরাবর দাতব্য কর্মকে পুণ্য কার্য বলে মনে করে। যেমন অভাবগ্রস্তদের অর্থপ্রদান, একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে যা একজন ব্যক্তির পরবর্তী জীবনের জন্য তার ভাল কর্ম গঠনে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করে। যদিও অক্ষমতাকে সামাজিকভাবে খুবই লজ্জাজনক কিছু হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিছু পরিবার প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে বন্দি করে রাখে, হিন্দুধর্ম বলে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়া এবং প্রসারিত করা সমস্ত অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধর্মীয় কর্তব্য। তবে শিক্ষাকে আজ আর শুধু নীতি হিসেবে শুধু স্মরণে না রেখে কার্যক্রম রূপে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই কার্যক্রমকে সার্থক রূপ দিতে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রয়োজন সকলের জন্যে উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ প্রয়োগ।

তথ্যসূত্র :

১. Special Education for mentally handicapped pupils, A teaching manual, times mirror
২. ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা —- ডঃ অনুরাধা চাড্ডা, যোজনা পত্রিকা, জানুয়ারী ২০১৬ সংখ্যা
৩. INCLUSIVE EDUCATION IN INDIA – CONCEPT, NEED AND CHALLENGES, —JD Singh
৪. অষ্টাবক্র মহাকাব্য

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাব্যবস্থার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও অনুবাদ : *রামায়ণ*-এর সূত্রে

দেবলীনা সেন

সংক্ষিপ্তসার : বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝার হাত ধরে বাঙালি লাভ করেছিল এক অমূল্য সম্পদ *শ্রীরাম পাঁচালী*। ভারতবর্ষের আদি কবি বাল্মীকি *রামায়ণ* রচনা করেছিলেন যে দেবভাষা সংস্কৃতে, যে ভাষাকে পাণিনি প্রমুখ ব্যাকরণের কঠোর কঠিন নিয়মজালে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যে ভাষায় অধিকার ছিল না আপামর জনসাধারণের, অধিকার ছিল না শূদ্রের, সেই সংস্কৃত ভাষার নিয়মনিষ্ঠা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে *রামায়ণ* মুক্ত হয়ে অনূদিত হতে থাকল ভারতবর্ষের একাধিক আঞ্চলিক ভাষায়, অনূদিত হতে থাকল লোকায়ত ছন্দে। ভারতের সীমানা, হিন্দু ধর্মের সীমানাকে অতিক্রম করে গেল ভারতীয় এই মহাকাব্য যখনই সে সংস্কৃতের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার দিকে তাকালে দেখা যাবে, কেবল কৃত্তিবাস নন, চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীধর, গঙ্গাদাস, ভবানীদাস, দুর্গারাম, জগৎরাম রায় শিবচন্দ্র সেন, অদ্ভুতাচার্য্যের মতো বহু কবি *রামায়ণ* অনুবাদে হাত দিয়েছেন। বাংলা সহ ভারতবর্ষের একাধিক পরিভাষায় ঘটল আদি মহাকাব্যের পরিগ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *প্রাচীন সাহিত্য* বইয়ের *রামায়ণ* প্রবন্ধে বলেছিলেন, *রামায়ণ* ও *মহাভারত* এর মধ্যে ‘সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।’ যে *রামায়ণ* আসলে জনসাধারণের কাব্য, জনমানসের কাব্য, যা আসলে সংস্কৃতকে দেবভাষা করে তোলার মধ্যে দিয়ে কেবল সমাজের এলিট শ্রেণীর মধ্যে গতিরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তা যখন অনূদিত হতে, পরিগৃহীত হতে শুরু করল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়, তখনই যেন *রামায়ণ* এরও শাপমুক্তি ঘটল পাষাণী অহল্যার মতো। আমরা এখানে যে প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করতে চাইছি তা হল – কেন হঠাৎ

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় *রামায়ণ* এর এত অনুবাদ হল? এর পেছনে কি সমসাময়িক কোনো আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা কাজ করছে? তার পেছনে কি কেবল তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলার বিপর্যস্ত আর্থসামাজিক অবস্থা দায়ী? না কি ষোড়শ শতাব্দী জুড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যখন ভক্তি আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, মীরা-নানক-দাদু-কবীরেরা যখন প্রাদেশিক ভাষাকে তাদের বাহন করেছিল, তারও একটা প্রভাব কাজ করেছিল এখানে? আমরা দেখতে চাইছি এই যে *রামায়ণ* এর ভারত ও বহির্ভারত বিজয় সম্ভব হল তা কি আসলে এই মহাকাব্য দেবভাষা থেকে বেরিয়ে প্রাদেশিক ভাষায় আসতে পেরেছিল বলেই সম্ভব হল? আদি মহাকাব্যের এই প্রাদেশিক ভাষায় চর্চার বিষয়টি এখানে দেখতে চাওয়া হচ্ছে। এত পরিমাণে *রামায়ণ* অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেসময়ের বাংলার জনমানসের পাঠকের অনুবাদকদের কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্বের খোঁজ মেলে কি? অনুবাদে-পরিগ্রহণে-অনুসৃজনে-নির্মাণে-বির্নিমাণে কৃত্তিবাস কৃত *রামায়ণ* এর বাংলা অনুবাদ সংস্কৃত থেকে কোথায় সাদৃশ্যমণ্ডিত আবার কোথায় আলাদা এবং তার মধ্যে দিয়ে বাংলার ও ভারতীয় সংস্কৃতির কোন্ দিকগুলি উঠে আসে এর খোঁজও আমাদের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ : রামায়ণ, সংস্কৃত ভাষা, প্রাদেশিক ভাষা, পরিগ্রহণ, অনুবাদ।

শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে,
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।[১]

১৯৬৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিটি। ঋত্বিক ‘সুবর্ণরেখা’ ছবিটিতে *রামায়ণ* এর মিথটি ব্যবহার করেছিলেন। সিনেমার চরিত্রগুলির নাম আমাদের হয়তো মনে পড়ে যাবে— সীতা অভিরাম কৌশল্যা। সিনেমাতে দেখা গিয়েছিল, অভিরাম নামক ছেলেটি তার মাকে হারিয়ে ফেলেছিল। মায়ের নাম কৌশল্যা। অভিরাম প্রায় হঠাৎ করেই মাকে

খুঁজে পায় ঘাটশিলা স্টেশনের আগে ছাতিমপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। দণ্ডকারণ্যের দিকে রিফিউজিদের নিয়ে যে ট্রেনটি যাচ্ছিল, তারই গার্ড একজন মহিলাকে এই ছাতিমপুর ষ্টেশনে নামিয়ে দেয় অসুস্থ বলে। তার প্রায় অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। এই সময় অভিরাম তাকে মা বলে এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক মহিলা তাকে সম্বোধন করে বাগদি বউ বলে। ঋত্বিক এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা না করেই এর পরে একটা অসম্ভব ক্যাকোফোনি তৈরী করেন। ১৯৬২ সালে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক আসলে প্রশ্ন করতে চাইলেন *রামায়ণ* যদি ভারতীয় মহাকাব্য হয় তাহলে রামচন্দ্র কি সত্যিই ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজকুমার? কৌশল্যা কি সত্যিই সূর্য বংশীয়া সম্ভ্রান্ত কোনো রাজনন্দিনী? নাকি সাবঅল্টার্ন? আসলে কি ঋত্বিক এটাই বলতে চেয়েছিলেন, এদেশে যদি কোনো জাতীয় মহাকাব্য থেকে থাকে তাহলে তা অনিবার্যভাবে *রামায়ণ*, কিন্তু সেই রামায়ণ এর নায়িকা কৌশল্যা রাজনন্দিনী, ইক্ষ্বাকু বংশীয়া রাজমাতা নন, তিনি নিতান্তই বাগদি বউ, অন্ত্যজ এক নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি। ঋত্বিক কি আসলে এখানে কালিক বাস্তুহারার সমস্যার কথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মানুষের আত্মচ্যুতির কথা ভাবছিলেন এবং যে আত্মপরিচয়ের খোঁজ তিনি একভাবে করলেন ভারতীয় প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে? এ প্রসঙ্গে হয়তো মনে পড়ে যাবে দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বলা কয়েকটা কথা—

> এই জন্যেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে, মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্রধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলিমৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে। এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে- রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।[২]

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে নজরটান চিহ্নিত অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ক্রমটিকে রাখলেন, তা খেয়াল করতে হবে। সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন, রামায়ণ-কাহিনীর ও বাল্মীকির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বৌদ্ধ সাহিত্যে। একটি পালি জাতক-গাথায় দশরথের মৃত্যুর পর রামের কাছে ভরতের আগমনের প্রসঙ্গ আছে। বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* কাব্যে বাল্মীকির স্পষ্ট উল্লেখ আছে – মহর্ষি চ্যবন যা গ্রন্থবদ্ধ করতে পারেননি, সেই, পদ্য বাল্মীকির নাদই সৃষ্টি করেছিল। বাল্মীকি *রামায়ণ* এর রচনা ঠিক কবে, *রামায়ণ* না *মহাভারত* কে পূর্ববর্তী এই সংক্রান্ত মতবিরোধে প্রবেশ করা আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয়। আমরা দেখতে চাইছি, যেখানে পাণিনি প্রভৃতিরা ব্যাকরণের নিগড়ে বেঁধে দিচ্ছেন ভাষাকে, যেখানে সংস্কৃতকে দেবভাষার আসনে বসিয়ে আসলে এলিটদের প্রাধান্য দিয়ে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ যাদের মুখের ভাষা ছিল ‘প্রাকৃত ভাষা’, সেই প্রাকৃত জনকে বঞ্চিত করা হল, যেখানে এরকম ট্যাবু তৈরি করা হয়েছিল আঠারো পুরাণ প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করলে রৌরব নরকে স্থান হবে, সেখানে *রামায়ণ* কীভাবে কখন কেন সেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘেরাটোপকে অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষের কাছে এসে পৌঁছাল? ১৩০৯ বঙ্গাব্দের বিশ্বকোষ এ মুদ্রিত ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের সংখ্যাটা একবার দেখে নেওয়া যাক – মারাঠি ভাষায় আটটি, তেলেগুতে পাঁচটি, তামিলে বারোটি, উৎকল ভাষায় ছয়টি, হিন্দিতে এগারোটি, বাংলায় পঁচিশটি। এরপরে অতিবাহিত হয়েছে দীর্ঘ সময়। এর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ এর অনুবাদের আরো পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। কেবল ভারতবর্ষ নয়, বহির্ভারতে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, বালি জবদ্বীপে সেখানকার স্থানীয় ভাষায় রামায়ণ পাওয়া গেছে। চীন, জাপান, পারস্য, ইরান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশেও রামায়ণের অনুবাদ সাদরে গৃহীত হয়েছিল। এখান থেকেই উঠে আসে সেই প্রশ্ন *রামায়ণ* যদি কেবল রাজার ঘরে, কেবল যদি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিগড়ের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকত, তা যদি প্রাদেশিক ভাষায় ‘মুদির দোকান’ পর্যন্ত এসে না পৌঁছাত, যদি না সে রক্ষণশীলতার অর্গল ভেঙে প্রাকৃতজনের কাছে এসে পৌঁছাত, শূদ্রজন, অস্পৃশ্যজনের আঙিনায় যদি সে না এসে দাঁড়াত, তাহলে কি আদৌ *রামায়ণ* এর সমগ্র ভারতজয় ও বহির্ভারত বিজয় সম্ভব হত? আরো একটা বিষয় খেয়াল করার ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়

অনূদিত *রামায়ণ* গুলির কাহিনি এবং বাল্মীকি রামায়ণ-এর কাহিনি হুবহু এক নয়। এটাকেও অনুবাদকদের এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তাঁরা অনেকেই তাঁদের সময়ের কথা, পরিপার্শ্বের কথা মাথায় রেখে পরিগ্রহণ করেছেন। ফলত তা হয়তো মূলের নকল হতে পারেনি, বরং অনুসৃজন হয়ে গেছে। তাহলে কি রামায়ণ এর মধ্যে এমন কিছু কিছু উপাদান ছিল, যা বাল্মীকির পরে বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি? রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করেই কি এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে - *'অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।'* [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রামায়ণ,* প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৭১২।] যে দুটি প্রশ্ন এর পরেই আমাদের মাথায় আসে তা হল – রামায়ণ প্রাদেশিক ভাষায় এত অনূদিত হতে পারল কেন? এর পেছনে কি ভক্তি ধর্মের, ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের কোনো প্রভাব আছে? দ্বিতীয়, কেন অনুবাদের জন্য অনুবাদকেরা রামায়ণকেই নির্বাচন করলেন? আসলে মানুষ কি রামচন্দ্রের মতো একজন অথরিটির কাছে সাবমিশন করতে চায়? এই দুই প্রশ্নের উত্তর একবার খুঁজে দেখা যাক।

খেয়াল করার মতো, আধুনিক ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম তামিল ভাষাতে 'বাল্মীকি রামায়ণ' অনূদিত হয় ১১শ শতাব্দী নাগাদ। দ্বাদশ শতাব্দীতে তামিল কবি কম্বন্ রচিত *রামাবতার কাব্যম,* যা সাধারণত *কম্ব-রামায়ণ* নামে পরিচিত এবং যাকে তামিল ভাষার শ্রেষ্ঠ রামায়ণ অনুবাদ বলে মনে করা হয়, তা ভক্তিরসের কাব্য বলেই স্বীকৃত। চৈতন্যদেব (১৪৮৬ খ্রীঃ-১৫৩৪ খ্রিঃ) এর আবির্ভূত হয়ে বাংলা সহ সারা ভারতকে ভক্তির জোয়ারে জারিত করার অনেক আগেই ভক্তিবাদের উদ্ভব ঘটেছিল দ্রাবিড়ে। ভি. রাঘবন ভারতীয় ভক্তিবাদী আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করেছেন, আমাদের এই আলোচনার সূত্রে তার মধ্যে থেকে কয়েকটি বিশেষত্ব একটু লক্ষ করা যাক—

- এঁদের ধর্ম আন্দোলনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষ – 'common people'

- এই ধর্ম আন্দোলনের ভাষা সাধারণ, প্রাকৃত জনসাধারণের মুখের বুলি – 'They adopted the local language.'
- সমাজের নানা স্তর, বর্গ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতি সংস্থান থেকে তাঁরা এসেছেন। - 'They came from all classes and starta of the society.

নজরটান চিহ্নিত অংশগুলি প্রতিটিই কি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছে না কি? এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাথায় রেখেই ফিরে আসা যাক *কম্ব-রামায়ণ* এ। 'বাল্মীকি রামায়ণ' যে ভক্তিরসের কাব্য নয়, তা সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য। আদি মহাকাব্যের সূচনায় রামচন্দ্র কোনো অবতার ছিলেন না। বাল্মীকি তাঁকে মানুষ রূপেই কল্পনা করেছিলেন। *রামায়ণ* এর আদিকাণ্ডে বাল্মীকি নারদকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেটা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে কোনো অবতারের জয়গান রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—

হে মুনে! বর্তমানকালে পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণ্‌বান্, বীর্যবান্, ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? – কোন্ ব্যক্তি সর্বপ্রাণীর হিতসাধন করেন? কোন্ ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং কোন্ ব্যক্তি সন্ধি-বিগ্রহাদি সকল কর্মেই সমর্থ ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তি ধর্মশীল, কোন্ ব্যক্তি অতিশয় কান্তিমান, কোন্ ব্যক্তি রোষ ও পরশ্রীকাতরতাকে পরাস্ত করিয়াছেন? দেবগণও যুদ্ধে কাহাকে রোষাবিষ্ট দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন?[৩]

মূল মহাকাব্যের যে অল্প কয়েকটি জায়গায় রামাবতারের কথা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে পণ্ডিতেরা পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বা সংযোজন হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান। *রামায়ণ*-এর প্রধান যে দুটি চরিত্রকে বৈষ্ণবদের ভক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় – হনুমান এবং বিভীষণ, অনুবাদ-কাব্যগুলিতে যেভাবে তাদের আলম্বন করে ভক্তিরস বর্ণিত হয়েছে, মূল 'বাল্মীকি রামায়ণ' এ এদের ঠিক অনুরূপ পরিচয় মেলে না। ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তকবি তুলসীদাসের 'তুলসীদাসী রামায়ণ', যা ভক্তিরসে আগাগোড়া মোড়া, সেখানে রাবণের কাছে রামের পরিচয় দিতে গিয়ে হনুমান তাকে অবতার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে, যা মূল রামায়ণে ছিল না—

সুনু রাবণ ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচিত মায়া।।
জাকেঁ বল বিরিঞ্চি হরিঈসা। পালত সৃজত হরত দসদীসা।।

ধরই জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা। . . .
জাকে বল লবলেস তেঁ জিভেহু চরাচর ঝারি।'
তাসু দূত মৈঁ . . . [৪]

শুধু আত্মপরিচয়েই থেমে যায় না সে, বরং রাবণকেও ওই ভক্তভয়হারী ভগবানের ভজনা করতে উপদেশ দেয় তুলসীদাসের হনুমান। অন্যদিকে বিভীষণ যে রামভক্ত পুরুষ, তা অন্তত 'বাল্মীকি রামায়ণ' এর বিভীষণ চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় না। সেখানে রাবণকে সীতাহরণের পর বিভীষণ যতবার উপদেশ দিয়েছে, সেখানে মূল লক্ষ্য হয়েছে ন্যায়ধর্ম আচরণ। এই বিভীষণ তুলসীদাসী বিভীষণের মতো রামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি অনন্ত ব্রহ্ম হিসেবে – *'তাত রাম নহিঁ নরভূপালা।/ভুবনেস্বর কালহু কর কালা।।/ ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা।/ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা।।'* [বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য,* ১৯৬১, লেখাপড়া, পৃ – ১৩৮।] মেঘনাদের নাগপাশে আবদ্ধ রাম লক্ষ্মণকে দেখে বিভীষণ যেভাবে রাজ্যলাভের আশা বিনষ্ট হতে দেখে রোদন করেছে – *'যয়োর্বীর্য্যমুপাশ্রিতা প্রতিষ্ঠা কাঙ্খিতা ময়া।/তাবুভৌ দেহনাশায় প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ।।/জীবন্নস্য বিপন্নোহস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ।* (৬। ৫০। ১৮-১৯), [বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য,* ১৯৬১, লেখাপড়া, পৃ – ১৩৮] তাকে কি কোনোভাবে ভক্তজনের উক্তি বলা যায়? [বাংলা – হায়, যাদের বীর্যের উপর নির্ভর করে আমি প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, সেই পুরুষপুঙ্গব রাজনন্দন যুগল দেহ নাশ করবার জন্য শুয়ে রয়েছেন। এদের এরূপ অবস্থায় আমি জীবন্ত থেকেও বিপন্ন হলাম, আমার রাজ্যলাভের আশা বিনষ্ট হল।] 'কম্ব-রামায়ণ' এবং 'তুলসীদাসী রামায়ণ' এ রামচন্দ্র নিজেই যেভাবে নিজের ভগবৎ-সত্তা সম্পর্কে সচেতন, তিনি নিজেই যেভাবে একাধিক স্থানে কখনো ইঙ্গিতে কখনো প্রকাশ্যে নিজের ভগবৎ সত্তার কথা বলেছেন, তা বাল্মীকি রামায়ণে অনুপস্থিত। 'বাল্মীকি রামায়ণ' এ রাম ব্রাহ্মাদের দ্বারা বন্দিত হলে বলেন, 'আত্মানাং মানুষং মন্যে।' আর এদিকে তুলসীদাসের রামচন্দ্র সীতাকে বলেন, 'মৈঁ কছু করবি ললিত নরলীলা।' 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ বলা হয়েছিল, একাদশ সহস্র বছর রাজত্ব করে রাম ব্রহ্মলোকে গমন করবেন। রামচন্দ্র মানুষ না হয়ে স্বয়ং বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অবতার হলে এ কথা বলা হত না। বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্রও রামের অবতার সম্পর্কে কিছু যে

জানতেন, এমন প্রমাণও কিন্তু মেলে না। তাই 'বাল্মীকি রামায়ণ' এর রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বলা চলে –

বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত, সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রাম মহিমান্বিত। . . . রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে।[৫]

বাল্মীকির রামচন্দ্র মানুষ, আর ষোড়শ শতাব্দীর তুলসীদাসের রাম নারায়ণ। তুলসীদাসের রামায়ণের সমস্ত চরিত্র, সব ঘটনার একটাই উদ্দেশ্য – রামচন্দ্রের ঐশ্বর্য প্রচার। সেখানে প্রতিটি নরনারী থেকে মুনিঋষি, বানর বাহিনী থেকে লঙ্কার রাক্ষসকুল ভগবান রামের চরণাশ্রিত হতে চায়। এর মাঝখানে বোধহয় রাখা চলে কম্বনের রাম এবং *রামায়ণ*কে। রামের ভগবানরূপ প্রতিষ্ঠা কম্বনেরও উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বাল্মীকির মানুষ রামকে কম্বন একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। কম্বন কাহিনি অংশে বাল্মীকিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তুলসীদাস বাল্মীকির যে সব অংশ রামচন্দ্রকে ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সহায়ক নয়, তাকে তিনি বাদ দিতে কুণ্ঠিত হননি। তাই দেখা যাবে বালিবধ অংশ বা শূর্পনখা প্রসঙ্গ তুলসীদাসে উল্লেখমাত্র রয়েছে, কিন্তু কম্বনে তেমন নয়। এখানে তুলসীদাস ও কম্বনের তুলনা করা উদ্দেশ্য নয়, আমরা দেখাতে চাইছি দুই সময়ের দুজন কবির কলমেই রাম কীভাবে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা হলেন, অথচ *রামচরিতমানস* এর কবি এবং কম্বন দুজনেই রামভক্ত হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কত আলাদা। কম্বনেও রাম বিষ্ণুর অবতার, কমলাক্ষ প্রভু, কৃষ্ণ, নারায়ণ, পরমপুরুষ, বেদাতীত। রাম যেখানে মারীচের পেছনে ছুটছেন, সেখানে কম্বন রামকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন একবার দেখা যাক – *'নীট্টিনান্ উলগম্ মুণ্ডুম্ নিণ্ড্র এড়ুত্তু অলন্দ পাদ্‌ম'* (৩। ১১। ৭১) [বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য*, ১৯৬১, লেখাপড়া, পৃ – ১৫৫] (বাংলাঃ – যে পা দিয়ে তিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন, সেই পা বাড়িয়ে দেন।) রামের অহল্যা উদ্ধার, রাম কর্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণ, নাগপাশে আবদ্ধ রাম লক্ষণ উদ্ধারের জন্য গরুড়ের আবির্ভাব এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম্বন রামকে ভগবানের অবতার রূপেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে রামের বীরত্ব দেখে কম্বনের রাবণ

ভেবেছে একি বেদ-এ কথিত প্রথম কারণ? বাল্মীকির *রামায়ণ* এ রামচন্দ্রের মিথিলায় প্রবেশ মাত্র একটি লাইনে বলে দেন আদি কবি আর সেখানে 'কম্বন্-রামায়ণ' এ বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র যখন প্রবেশ করছেন মিথিলায়, লক্ষ্মীর অংশ সীতা যেখানে দয়িতের জন্য প্রতীক্ষায় রত, তখন কম্বনের কলম ভক্তসুলভ আবেগে ছুটেছে। বর্ণনা সেখানে দীর্ঘ। 'কম্ব-রামায়ণ'-এ হরধনুভঙ্গের আগে রাম ও সীতার পূর্বরাগের বর্ণনা আছে, এই পূর্বরাগ দর্শন জাত। বাল্মীকিতে এ হেন কোনো পূর্বরাগ নেই। কম্বন হনুমান ও বালি এবং বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণকে এঁকেছেন অনুগত রামভক্ত করে। একটা উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক— অশোকবনে হনুমান সীতার কাছে সাক্ষাতে এলে সীতা যখন জিজ্ঞাসা করে সে কীভাবে এই সমুদ্র পার হয়ে এল, তখন হনুমানের উত্তর— যাহারা তোমার অতুল্য প্রভুর চরণ যুগলের ধ্যান করে তাহারা যেমন এই বৃহৎ মায়া-সমুদ্র পার হইয়া যায়, আমিও তেমনি এই কৃষ্ণ সমুদ্র পার হইলাম। এমনকি হনুমান এখানে রাবণের কাছে প্রথম আত্মপরিচয় দেওয়ার সময় নিজেকে 'কমল-নয়ন অদ্বিতীয় ধনুর্ধরের দূত' বলে রামের ভগবৎস্বরূপের পরিচয় দিতে থাকে। কম্বনের বালি সুগ্রীবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যায় রামচন্দ্রের হাতে তাকে মৃত্যুর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ও মুমূর্ষু বালি রামচন্দ্রকে এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যায় – *'মরৈকলুম্ মুনিবর্ যারুম্ মলরমিচৈ অয়নুম্ মট্রৈত্/তুরৈকালিন্ মুডিবুম চোল্লুম তুণি পোরুল তিণি বিল্ তুকি,/অরৈ কলল্ ইরামন্ আকি অর নেরি নিরুত্ত বন্দদু;/ইরৈ ওরু চঙ্কৈ ইণ্ড্রি এণ্ণু দি এণ্ণম্ মিক্কোয়্!'* (৪। ৭। ১৩৭।) [বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য,* ১৯৬১, লেখাপড়া, পৃ – ১৬৫] (বাংলা – বৎস, মুনি ব্রহ্মা বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যাঁর কথা বলেছে, সেই পরম পুরুষ পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য হাতে তীক্ষ্ণ ধনুঃ-শর নিয়ে পায়ে নূপুর পরে শ্রীরামচন্দ্ররূপে এসেছেন।) 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ এরূপ কোনো উচ্চারণ ছিল না। বাল্মীকি রামায়ণে যেখানে বিভীষণের চরিত্র নির্দোষ নয়, বরং রাজ্য লোভ খুব তীব্রভাবে না হলেও দেখা গেছে তার মধ্যে, সেখানে কম্ব রামায়ণ সহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিভীষণ রামভক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতের তিরষ্কারের বদলে বিভীষণ রামকে প্রতিষ্ঠা করেন দেব বলে, ধর্ম বলে – ' *"আরত্তিনৈপ, পাবম্ বেল্লাদু" এন্নুম অদু অরিন্দু "এঞানত্/ তিরত্তিনুম উরুম" এণ্ড্রু এপ্পি দেবর্ক্কুম্ দেবৈচ্ চেরেন্দন্;/পুরত্তিনিল্ পুকড়ে আক; পলিয়োড়ুম পুর্ণক; ভোগচ্/চিরপ্পু ইনিপ্*

পেরুক; তীর্ক এণ্ড্র নন্ চীট্টম ইল্লান্।' (৬: ২৭। ১৭৬) [বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য,* ১৯৬১, লেখাপড়া, পৃ – ২০৫] [বাংলা – আমি জানি অধর্ম কখনও ধর্মকে জয় করতে পারে না এবং তা জেনেই দেব-দেব শ্রীরামচন্দ্রের শরণ নিয়েছি। এর ফলে বাহ্য জগতে আমার স্তুতি হোক কিম্বা নিন্দা হোক, ভোগৈশ্বর্য সঞ্চিত হোক বা নষ্ট হোক সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই।] সুগ্রীবের মুখ থেকে রামের আশ্রয়দানের কথা শুনে কম্বনের বিভীষণ ভাবে – বিষ যেমন শিবের কণ্ঠে স্থান পেয়েছে, প্রভুর কৃপায় আমিও তেমন উচ্চ হলাম। কম্বন দ্বাদশ শতাব্দীর কবি, আর তুলসীদাসের সময় ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ – ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ। তুলসীদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। চৈতন্যের আবির্ভাবে সারা ভারত জুড়ে ভক্তি আন্দোলন যখন জোয়ার তুলেছে, সমাজের বর্ণভেদ শ্রেণীভেদ জাতিভেদ উচ্চনীচভেদকে নস্যাৎ করে দিয়ে চৈতন্য যখন সবার উপরে মানুষকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন, অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শূদ্রদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অত্যাচার থেকে বের করে এনে চৈতন্য যখন সমাজ বিপ্লব ঘটিয়েছেন তুলসীদাসের আবির্ভাব সেই চৈতন্য-পরবর্তীকালে। তাই কম্বন এবং তুলসীদাসের রামায়ণের মধ্যে ভক্তিরসে, রামের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যে পার্থক্য থাকবে তা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এই দুই কবির কাব্যকেই ভক্তিরসের কাব্য বোধহয় বলা চলে। এবং এই দুজনের কথা বলতে গিয়ে আমাদের কি আরেক কবির অনুষঙ্গ মনে পড়ে যায় না? তিনি বাংলাদেশের ঘরের কবি কৃত্তিবাস। সময়ের নিরিখে কৃত্তিবাসের অবস্থান কম্বনের পরে, তুলসীদাসের আগে। কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ববর্তী সময়ের বাংলার মানুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ তাঁর সময়। কিন্তু কৃত্তিবাসে প্রবেশের পূর্বে রামচন্দ্রের এই নর থেকে নারায়ণে যাত্রা কীভাবেই বা সম্ভব হল, কেনই বা উত্তরে যার জন্ম, তিনি দক্ষিণে নায়ক হিসেবে গৃহীত হলেন সেটা খুব সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া যাক।

বাল্মীকির রাম অযোধ্যার আর্য সন্তান হলেও, রামভক্তির সূচনা ও বিকাশ ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতে বলে মনে করছেন পণ্ডিতেরা। 'কম্ব-রামায়ণ' এ যে ভক্ত কবির পরিচয় পাওয়া গেল, তা থেকে এ কথা অনুমান করলে হয়তো খুব ভুল হবে না যে কম্বনের আগে থেকেই রামভক্তির বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল তামিলনাড়ুতে। কম্বনের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। কম্বনের অনেক আগেই তামিল সঙ্ঘোত্তর সাহিত্য 'চিলপ্পধিকারম' (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক),

'মণিমেখলৈ' ইত্যাদি গ্রন্থে 'কম্ব রামায়ণ' এর মতো রামভক্তির চেহারা না দেখা গেলেও রামের প্রতি ভক্তিপূর্ণ মনোভাবের দেখা মিলেছে। ভারতীয় ভক্তি সাহিত্যের গবেষকেরা বলছেন, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগে থেকেই তামিলনাড়ুতে রামকে অবতার রূপে ভাবা শুরু হয়ে গেছে। 'চিলপ্পধিকারম' এ তার প্রথম প্রকাশ। একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত আলোয়ার সাধকদের রচনায় রামভক্তির প্রকাশ। কম্বন এই ধারাবাহিকতারই ফসল। কিন্তু আর্য সন্তানকে দক্ষিণ ভারত এত সমাদরে গ্রহণ করল কেন? 'বাল্মীকি রামায়ণ' এ আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সংঘাতের প্রসঙ্গও রয়েছে, যার প্রমাণ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র সংঘাত। তাই কি এই বীরকে গ্রহণের মধ্যে সেই সময়ের পরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এক জাতীয় মনোবৃত্তির ছবি ধরা পড়ে? দ্বিতীয়ত রামচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের আর্য-অনার্য সংঘাতকে ঘৃণার দ্বারা, যুদ্ধের দ্বারা নিপীড়ন নিগ্রহের দ্বারা, বিদ্বেষের দ্বারা সমাধান করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা বেশি, বরং প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা কাছাকাছি আনতে হবে বিরোধীদের। তাই রামচন্দ্র বা-নরদের এবং রাক্ষসদের জয় করলেন প্রেমধর্মের দ্বারা। খেয়াল করার মতো রামচন্দ্রের প্রথম ভক্ত হনুমান ও বিভীষণ কেউ আর্য ভারতের অধিবাসী নন। রামচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে তাঁর অসামান্য কূটনীতির, বিচক্ষণ শাসকের, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক রাজনৈতিকের, প্রগতিশীলতার পরিচয় দেয়। এবং এ কথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে রাম যদি প্রেমধর্মের পরিবর্তে বিদ্বেষকে অস্ত্র করতেন, তাহলে রামচন্দ্রের পক্ষে এই ব্যাপক জয় সম্ভব হত না। তাহলে রাম হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে, স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর কাছে স্বীকৃত হতে পারতেন, কিন্তু রামচন্দ্র যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘেরাটোপ ছেড়ে প্রাকৃত জনের কাছে পূজার ভক্তির পাত্র হয়ে উঠলেন, সেটা সম্ভব হত না। এই কারণেই হয়তো প্রথমে উত্তরভারতে রাম গৃহীত না হলেও রামকে কেন্দ্র করে ভক্তির স্ফুরণ ঘটল দক্ষিণ ভারতে। আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যেতে হয়--

তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে, তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের

বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।[৬]

তামিল কবি কম্বন আসলে যা রচনা করলেন, তা আসলে দক্ষিণের জনমানসের ভক্তমনের একটা সামগ্রিক চেহারা, কবির একার বক্তব্য নয়। আরো একটা বিষয়, কম্বনের আগে তামিলনাডুতে যে ভক্ত দল বা ভক্ত কবিদের উদ্ভব ঘটেছিল, তার মধ্যে তিরুমুলার (তৃতীয় – সপ্তম শতক) এর আরাধ্য ছিলেন শিব, বাকি নয়নমার দল তৃতীয় শতক) আলওয়ার দল তৃতীয় শতক), অণ্ডাল এঁদের প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু। এখান থেকে বোধহয় রামচন্দ্রকে তামিলনাড়ুতে কেন বিষ্ণুর অবতার এর সঙ্গে মেলানো হল তার একটা সূত্র পাওয়া যায়। আর একটা বিষয় লক্ষ করার, চৈতন্য আবির্ভাবের পরে ভক্তি আন্দোলন যখন জোয়ার তুলছে, তখন আরাধ্য দেবতা হিসেবে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ প্রাধান্য লাভ করার পাশাপাশি কোথাও কোথাও আরাধ্য দেবতা হিসেবে রামকেও পাওয়া যাচ্ছে, যা কিন্তু চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে দেখা যায়নি। সমর্থ রাম দাস (মহারাষ্ট্র, সতেরোশ শতক), ভদ্রাচল রামদাস (অন্ধ্রপ্রদেশ, উনিশ শতক), রামলিঙ্গস্বামী (চিদাম্বরম, উনিশ শতক) এদের আরাধ্য দেবতা হিসেবে আমরা রামকে পাচ্ছি।

এবার আমরা চলে আসি বাংলায়। কৃত্তিবাস আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে কৃত্তিবাসের অনুবাদের আগে থেকেই বাঙালি জীবনে বাঙালি মননে রামায়ণের ধারা অব্যাহত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় বাঙালির রামায়ণ চর্চার নিদর্শন পাওয়া গেছে অভিনন্দের *রামচরিত* গ্রন্থে। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে, মুরারী মিশ্রের *অনর্ঘ রাঘব* কাব্য, *রামায়ণ* এর কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা *কৈকয়ীভরত, কৃত্যারাবণ, বালিবধ* প্রভৃতি নাটকেও মেলে বাঙালির রামায়ণ চর্চার পরিচয়। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর *প্রাকৃত পৈঙ্গল* এ রাধাকৃষ্ণ হরগৌরী গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের বন্দনা করা হয়েছে এটা খেয়াল করার বিষয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকেও সেন রাজাদের আমলে রাজসভায় রামায়ণ চর্চার ধারা যে ব্যাহত হয়নি তার প্রমাণ মেলে হলায়ুধ মিশ্রের বিভিন্ন লেখায়, *সেকশুভোদয়াতে*। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ রাধাকৃষ্ণকে রামসীতার অবতার রূপে দেখানো হয়েছে। কালীয়দমন খণ্ডে দেখা যাবে বলভদ্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে সেই রামচন্দ্র।

এমনকি মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাঁদের চরিত্র নির্মাণে, বেহুলার শোকে, খুল্লনার মধ্যে, বারোমাস্যাগুলির মধ্যেও রামায়ণের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন কোনো কোনো গবেষক। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তো রামায়ণ-এর বিষয় নিয়ে পদ রচনা করেছেন। অন্যদিকে বাংলার লোকসঙ্গীতে, লোককথায়, পটুয়া সঙ্গীতে, পটচিত্রে, যাত্রা পালা গানে, পুঁথিপত্রে, কথকতায় তো ছড়িয়ে আছে *রামায়ণ* তার মতো করে। এটা চৈতন্য পূর্ববর্তী বাংলার ছবি। কৃত্তিবাসের জন্ম ঠিক কবে, তিনি গণেশের নাকি রুকুনুদ্দীন বারবাক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন এ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে মতবিরোধ প্রচুর। তবে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি চৈতন্যের আগে আবির্ভূত হন এবং কাব্য রচনা করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে তাঁর জন্ম। কৃত্তিবাসের কাব্যের ভক্তিরস ও তার উদ্দেশ্যকে বোঝার আগে অত্যন্ত সংক্ষেপে ওই সময়ের বাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার একটা পরিচয় নেওয়া যাক। বাংলায় পাল রাজাদের (সময়কাল আনুমানিক ৭৫০ খ্রী থেকে ১১৬১ খ্রী) বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে যে খানিক উদার আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, সেন রাজাদের (সময়কাল আনুমানিক ১০৭০ খ্রী– ১২৩৪ খ্রী) ব্রাহ্মণ্য পৃষ্ঠপোষকতায় তা বিনষ্ট হতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পালিয়ে যেতে হয়। এদিকে আবার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা দেশে শুরু হল তুর্কি আক্রমণ। অপ্রস্তুত বাংলা এই আক্রমণের ফলে একেবারে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তুর্কি আক্রমণে বাঙালি জীবনের মূলেই যখন কুঠারাঘাত পড়ল, তখন সাহিত্যচর্চা ও বিদ্যাচর্চায় যে সোনার ফসল ফলবে এমন আশা করা যায় না। বাঙালি দাঁড়াল এক তমসাচ্ছন্ন যুগের সামনে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শম্‌সু–দ্–দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ইতিহাস বলছে, বখতিয়ারের মৃত্যুর পর হোসেন শাহের রাজত্বের আগে পর্যন্ত পাঠান খিলজি বলবন মাহমুদ হাবসি সুলতানদের মধ্যে বাংলার সিংহাসনকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে বর্বরতা। ওদিকে গণেশের পুত্র যদুর পর গৌড়ের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে চলেছে অরাজকতা। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অব্দি বাংলায় কোনো সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। এদিকে স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা সেদিন মুসলমান শাসকদের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য

হিন্দু ধর্মকে পরাল সংকীর্ণতার বেড়ি, রক্ষণশীলতার শেকল। ফলে হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে শোষিত নিম্নবর্ণের মানুষগুলো চাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, মালো, এমনকি বৌদ্ধ, যারা বাংলা থেকে সেদিন পালায়নি তারা প্রভৃতিরা মুসলমান রাজার ধর্মগ্রহণ করে বাঁচতে চাইল। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* এই অস্থির সময়ের ফসল। রাজনৈতিক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণে বাঙালীর প্রাত্যহিক যাপন, অস্তিত্ব, জীবিকা, নৈতিক আদর্শ যখন অবক্ষয়ের পথে তখন কি দরকার ছিল রামচন্দ্রের মতো একজন নায়কের যাকে অবলম্বন করে বাঙালী আবার উত্তরণের পথ খুঁজতে পারত? এবং সেই রামচন্দ্র যদি বাল্মীকির মানব শ্রেষ্ঠ রাম হন, তিনি যদি সাধারণের ঘরের মানুষ না হতে পারেন, তিনি যদি খুব জটিল কঠিন গম্ভীর গূঢ় বাণী বলেন, তিনি যদি এমন আশ্রয় এমন আলম্বন না হতে পারেন, যে যাকে ধরে, যাকে ছুঁয়ে, যার নাম করেই প্রাকৃত জন উত্‌রে যেতে পারবেন তা হলে কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্য সফল হবে না, তা হলে রামকে প্রাকৃতজন গ্রহণ করতে পারবে না, দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে। তাই কৃত্তিবাস যদি খুব মূলানুগ অনুবাদ করতেন, তাহলে তা সাধারণ মানুষের কাব্য হয়ে উঠতে পারত না। আবার রামকে নরশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার থেকে যে যুগে বাংলার সাধারণ মানুষ রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলে উলুখাগড়ার মতো কাটা পড়ছে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অত্যাচারে আর পেটের ভাত জোটানোর জন্য যাদের ধর্মান্তরিত হতে হচ্ছে, এমন কোনো রাজা, এমন কোনো নায়ক, এমন কোনো বীর, এমন কোনো আশ্রয় যে যুগে নেই, যার চরণাশ্রিত হয়ে সেদিনের এই সাধারণ মানুষগুলো, এই নিম্নবর্ণের মানুষগুলো বেঁচে থাকার মন্ত্র পাবে, এমনকি উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা তাদেরকে এতদিন ধরে তাদের যাপিত ধর্মের থেকে করেছে বঞ্চিত, ইসলাম ধর্ম তারা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে তো খেয়েপরে কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্য, এ ধর্মের সঙ্গে তার কোনো হৃদয়ের যোগ নেই, সে যুগে রামকে অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাটা বোধ হয় বেশি প্রয়োজন ছিল। আবার রামকে উচ্চবর্ণের দেবতা করলে হবে না, তাকে হতে হবে এই অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষগুলির একান্ত আপন দেবতা। দরকার ছিল এমন একজন দেবতার, এমন একজন অথরিটির, যার কাছে প্রান্তজনেরা সাবমিশন করতে পারে নিজেদের। তাই সেটা দেবভাষার রামচন্দ্র হতে পারেন না, তাই রামকে নামতে হবে প্রাদেশিক ভাষায়। ওই যে বলা

হয়েছিল 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ দ্যুলোকে প্রচরিষ্যতঃ।/তাবদ্ রামায়ণী কথা ভূলোকে প্রচরিষ্যতি।।' এটা বাস্তবে সার্থক হতে পেরেছিল রামচন্দ্র যেহেতু দেবভাষা থেকে এলিট শ্রেণীদের থেকে মুক্ত হয়ে নেমে এসেছিলেন আঞ্চলিক ভাষায়, ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য। খেয়াল করার মতো, যেখানে উনিশ পুরাণের অনুবাদ নিয়ে ট্যাবু প্রচলিত ছিল, যেখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া দেবভাষায় অধিকার ছিল না একদিন সর্বসাধারণের সেখানে বাংলায় *রামায়ণ* অনুবাদ হল একজন কৃত্তিবাস ওঝার হাতে, যিনি ওই উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে পড়েন না। আরো একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটল যে কৃত্তিবাসের কাব্যে যে তা অনূদিত হল একেবারে লোকায়ত একটা ফর্মে, পাঁচালির ফর্মে। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীরাম পাঁচালী'। আমাদের হয়তো মনে পড়ে যাবে *জীবনস্মৃতি*র 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' অধ্যায়টি। বালক রবির 'রামায়ণ-মহাভারত' এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ব্রজেশ্বর নামক একজন ভৃত্যের সূত্রে, মায়ের সম্পর্কিত এক খুড়ি একজন বৃদ্ধা মহিলার সূত্রে। *'যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।'* [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪২০।] ঋত্বিক যে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের ষাট এর দশকের আগে, কৃত্তিবাস মধ্যযুগে দাঁড়িয়েই সেই প্রশ্নের উত্তর আসলে দিয়ে গেছেন যে *রামায়ণ* আসলে কাদের কাব্য। আমরা দেখে নিতে পারি 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' এর এই জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি—

'উড়িষ্যা হইতে কামরূপ এবং রাজমহল হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পঠিত হইত। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন হিন্দুপ্রধান গ্রাম দেখি নাই, যেখানে প্রতিসন্ধ্যায় কৃত্তিবাসের নাম উচ্চারিত হইত না। এই সেদিনও সন্ধ্যায় গ্রামের পথে বাহির হইলেই শুনিতাম মুদীর দোকান, কলুর ঘানি ঘর, জেলে মালার বাড়ী, মধ্যবিত্তের চণ্ডীমণ্ডপ ও ধনীর প্রাসাদ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের গৃহে সর্ব্বত্র শুনিতাম – 'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ। / লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেক গীত রামায়ণ।।'[৭]

নজরটান চিহ্নিত অংশটির ক্রমটা খেয়াল করার মতো। মনে থাকবে হয়তো মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন—

লোকনিস্তার ওই কাব্যের উদ্দেশ্য। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* অনুবাদ এই যুগচাহিদার ফল।

এবার চলে আসা যাক সেই প্রশ্নে যে 'শ্রীরাম পাঁচালী' কেন 'বাল্মীকি রামায়ণ' এর শৌর্য-বীর্য-বীরত্ব থেকে সরে এসে ভক্তির আকর গ্রন্থে পরিণত হল? কেন রামচন্দ্রসহ তার তিন ভাইও এখানে বিষ্ণুর অবতার? কেন সীতা লক্ষ্মীর অংশ? কেন লঙ্কাকাণ্ড এত ভক্তিরস দ্বারা জারিত? – *'গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী সবার উপর।/লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর/ . . ./মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।/এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ।/শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।/এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ।।'* [কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ – ১] চৈতন্যের আবির্ভাব না ঘটলেও বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবীয় এক ভক্তিরসের ধারা কৃত্তিবাসের আগে থেকেই প্রবাহিত হচ্ছিল তার একটা প্রমাণ চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলিগুলি দিলেও কেবলমাত্র এটাই কারণ বললে হয়ত সত্যের কাছে পৌঁছানো যাবে না। মনে রাখতে হবে কৃত্তিবাসের আগে থেকেই বাংলায় বৈষ্ণব ধারার সঙ্গে সঙ্গেই শাক্ত ধারাও প্রবাহিত হচ্ছিল, যার একটা প্রকাশ আমরা কৃত্তিবাসে দেবীর অকাল বোধনের মধ্যে হয়তো খুঁজে পেতে পারি। আমাদের মতে *রামায়ণ*কে বাংলার সাধারণ মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, নিম্নবর্ণের মানুষেরা, অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরা, খেটে খাওয়া পরিশ্রমজীবি মানুষগুলো, নারীরা ওই রাজনৈতিক আর্থসামাজিক বিপর্যয়ের সময় যাতে রামচন্দ্র, *রামায়ণ*কে আশ্রয় করতে পারে, যাতে তারা *রামায়ণ* এর কাছে অন্তত বেঁচে থাকার ভরসা আশাটুকু পায়, ওই বিপর্যস্ত সময়ে *রামায়ণ* যাতে সকলের জন্য বৈতরণী হয়ে উঠতে পারে, সেহেতুই 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' এ ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত। ভক্তিরস ছাড়া কেবল বীররসের কাব্য হলে সেদিন *রামায়ণ* আপামরের কাছে পৌঁছাতে পারত না। এর উত্তর খুঁজতে চলে আসা যাক গীতায়। সেখানে মুক্তির পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল জ্ঞানমার্গ একেবারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বুদ্ধিমান মানুষদের জন্য। তারপরে কর্মমার্গ, আর সাধারণের জন্য ভক্তিমার্গ। জ্ঞান বা নিষ্কাম কর্ম কোনোটাই সাধারণ মানুষদের কাছে আশ্রয় হতে পারবে না। মনে থাকবে গীতার 'কর্মযোগ' অধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন— 'লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।/জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং

কর্ম্মযোগেন যোগিনাম।।' মনে পড়বে 'ভক্তিযোগ' অধ্যায়ে জ্ঞানযোগী আর ভক্তিযোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের এই উত্তরে কৃষ্ণের সেই উত্তর – 'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।/অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।/তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।/ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।' তাই কৃত্তিবাসকে মূল থেকে সরে এসে যুগপ্রয়োজনে লোকনিস্তারকার্যে ব্রতী হয়ে বলতেই হয় – *'রাম নাম মহামন্ত্র নিঃস্রিল মুখে।।/যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে।/রাম নাম স্মরণে সকল গেল দূরে।।'* [কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ – ৫] বাল্মীকি থেকে দশরথ, হনুমান থেকে রাবণ সেখানে প্রত্যেকেই রামনামের মধ্যে খুঁজে পায় স্বর্গ। 'পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলা স্মরণ।/পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ।।/চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।/রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয়।' - সেই বিধ্বস্ত সময়ে দাঁড়িয়ে এমন কথা না বললে, রামকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত না করলে রামকে জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারত না। এমনকি বাল্মীকি রামায়ণে যে চরিত্রগুলি নেই বা সেভাবে বিকশিত হতে পারেনি, যেমন অঙ্গদ, অতিকায় তরণী সেন, বীরবাহুকে দিয়ে কৃত্তিবাস রামস্তব করান। লঙ্কা কাণ্ডে 'অতিকায়ের পতন' অংশে দেখা যাবে, লক্ষ্মণের হাতে অতিকায়ের মৃত্যু হলে অতিকায়ের কাটা মুণ্ড বলতে থাকে – *'অতিকায় মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে।।/ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।/প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে।।'* [কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ – ২৯৮।] কিংবা বিভীষণ পুত্র তরণী সেন যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় রামনামের নামাবলী পরে। সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণকে দেখার উদ্দেশ্যেই তার যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন। আবার কৃত্তিবাসের রাবণ রামের হাতে পরাজিত হয়ে রামচন্দ্রের মধ্যে ব্রহ্মসনাতনকে দেখে প্রার্থনা করে যান – *'অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।/দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।/চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।/শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।'* [কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ – ৩৯৪] এই 'রামায়ণ'কে কিছুতেই বাল্মীকির সঙ্গে মেলানো যাবে না। একটা প্রশ্ন এসে যায় – যে সময়ে বাঙালি মুসলমান শাসক দ্বারা পরাজিত, প্রাকৃত বাঙালী বিধর্মী শাসক থেকে শুরু করে উচ্চবর্ণের

হিন্দুদের দ্বারা শোষিত, জীবনযুদ্ধে হারতে হারতে যখন তাদের পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে, তখন কৃত্তিবাসের কাব্যে লঙ্কাকাণ্ডে অতিকায় থেকে রাবণ প্রতিটি শত্রুর রামের হাতে পরাজয় এবং পরাজয়ের পরে রামের কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে কি সেই পরাজিত সাধারণ বাঙালির সাবকনসাসের একটা ছবি ধরা পড়ে? যুদ্ধজয়ী রামের মধ্যে দিয়ে কি বিজিত বাঙালী একপ্রকার পালটা প্রত্যাঘাত গড়ে তোলে তার শোষকদের বিরুদ্ধে? একভাবে জয়ের আস্বাদ নেয় কি সে? যে বাঙালি মুসলমান শাসকদের প্রতি কোনোরকম প্রত্যাঘাত গড়ে তুলতে পারেনি, মুসলমান শাসনের আগে যে বাঙালিকে সেভাবে রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়তে হয়নি, ফলত রাজনীতি যুদ্ধনীতি সম্পর্কে যে বাঙালি খুব দক্ষ ছিল না, সেই বাঙালির রাম যখন শত্রুর কাছ থেকে রাজনীতির শিক্ষা নেন, তার মধ্যে সমকালের একটা ছাপ দেখতে পাওয়া যায় না কি? খেয়াল করতে হবে, এই রাম তার শত্রুদের প্রতি একবারের জন্যও ঘৃণার মনোভাব, বিদ্বেষের মনোভাব প্রকাশ করেনি। লঙ্কাকাণ্ডে দেখা যাবে রাম তার শত্রুদের মারতে 'বৈষ্ণব বাণ', 'বৈষ্ণব অস্ত্র' প্রয়োগ করছেন। এই 'বৈষ্ণব বাণ', 'বৈষ্ণব অস্ত্র' কি আসলে প্রতীকি? এই 'বৈষ্ণব অস্ত্র' কি আসলে বৈষ্ণব ধর্মেরই আর এক নাম, যা মানুষকে নস্যাৎ বা অস্বীকার করার কথা বলে না, বরং প্রেমধর্মের দ্বারা তাকে স্বীকৃতি জানানোর কথা বলে? কেবল শূদ্র চণ্ডাল গুহকের সঙ্গে হিন্দু রাম মিতালি করেনি, বরং সে প্রেমভাব দ্বারা শত্রুদের সে আপন করে নিয়েছে এটা বোধহয় লক্ষ করার। গুহক যেখানে রামের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় – 'চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে,/পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে।', এই বৈপ্লবিক প্রশ্ন আসলে গুহকের বকলমে কৃত্তিবাসের বকলমে সমগ্র ভারতের প্রান্তিক জনদের ওই উচ্চবর্ণের কাছে, ওই দেবতাদের কাছে যারা বর্ণব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। যে শত্রু তার পরম ভক্ত তাকে হত্যা করতে দ্বিধাপ্রকাশ করেছেন বাঙালির রাম। পরম বৈষ্ণব বীরবাহু হত্যা করতে গিয়ে রাম বলেন – *'কণ্টক ফুটিলে মোর ভক্তের শরীরে।/শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে।।/ভক্ত মোর পিতা মাতা ভক্ত মোর প্রাণ।/কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ।'* [কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ – ৩৩০] নিজের বীরত্ব প্রকাশের জন্য নয়, শত্রুর মুক্তির জন্যই আসলে নারায়ণের অবতার এই রামকে শত্রুকে হত্যা করতে হয়। রাবণ বধ প্রসঙ্গে

রাম বলেন – *'আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন।/শাপেতে রাক্ষসযোনি হয়েছে এখন।।/ . . ./এখনি মরিবে সে যে নাহিক সন্দেহ।/মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ।'* [কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ, পৃ – ৩৯৩] স্পষ্টত এখান থেকে বোঝা যায় এই রাম বাল্মীকির মানুষ রাম নয়, ইনি বিষ্ণুর অবতার। এখানে এসে হয়ত কম্বন কৃত্তিবাস তুলসীদাস একই রেখায় দাঁড়িয়ে যায়। কেবল বৈরী ভক্তির প্রকাশ ঘটেনি এখানে, হনুমানকে কেন্দ্র করে দাস্য ভক্তি এবং বিভীষণকে কেন্দ্র করে সখ্য ভক্তি ব্যক্ত হয়েছে এখানে। আবার ভক্তিধর্মে ভগবানকেও নেমে আসতে হয় তাঁর ভক্তের কাছে। তা না হলে সাধারণ মানুষ কীভাবে ছুঁতে পারবে তাকে? তাই এখানে 'ত্রিভুবনেশ্বর' রামকেও ভক্তকে বলতে হয়— *'কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার।/অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গণ।'* [পূর্বোক্ত, পৃ – ৪২২] রাম এখানে বাল্মীকির নরচন্দ্রমা নন। যুগমানসের চাহিদায় তিনি ভক্তের ভগবান – পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। তাই বুদ্ধদেব বসু যে বলেছিলেন, *'কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধহয় দুই অর্থেই – কেননা যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো লাগার কোনো স্মৃতি মনে আনতে পারি না।'* [বুদ্ধদেব বসু, *সাহিত্যচর্চা*, জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃ – ৯] – এটাকে সম্পূর্ণ সত্য বললে ভ্রান্তি ঘটবে মনে হয়, কারণ কৃত্তিবাস বুদ্ধদেব বসুর মতো 'হাই কালচারের' মানুষদের জন্য *শ্রীরাম পাঁচালী* লেখে তথাকথিত 'লো কালচারের' মানুষদের কাছে পৌঁছানোও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই কেবল রাম নন, দশরথ থেকে লক্ষ্মণ থেকে রাবণ, সীতা থেকে কৈকেয়ী, কৌশল্যা থেকে মন্দোদরী প্রতিটি চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেই কৃত্তিবাসকে মহাকাব্যের আদর্শ থেকে সরে এসে তাদের নামিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে প্রাকৃত মানুষদের স্তরে, তা না হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ কাব্যের, এর চরিত্রদের সংযোগ সম্পর্ক তৈরি হবে কীভাবে? তা না হলে *শ্রীরাম পাঁচালী* সাধারণ বাঙালীর ঘরের কাব্য হয়ে উঠতে পারবে না। তাই বাল্মীকির জায়গা থেকে কৃত্তিবাসকে বিচার করা বোধহয় অনুচিত। কেবল বাল্মীকি নন, কৃত্তিবাস তাঁর এ কাব্য রচনাতে বহু পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত নাটক, কাব্য, প্রচলিত লোকগাথা থেকে উপাদান নিয়েছেন। বাল্মীকির বেশ কিছু ঘটনা, বেশ কিছু বর্ণনা কৃত্তিবাস বাদ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎঋতুর

বর্ণনা। আবার তাঁর কাব্যের বেশ কিছু ঘটনা, বেশ কিছু বর্ণনা কবিরই মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। যেমন বাল্মীকির রাম-সীতার বৈদিক বর্ণনা থেকে সরে এসে বাংলার কবি এই বিবাহের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন বাঙালি বিবাহের ছবি, সংস্কার। কিম্বা যেখানে বাল্মীকির *রামায়ণ* দেবভাষার শুদ্ধতা, মহাকাব্যের গম্ভীরতা, ওজোগুণকে বজায় রেখেছে, সেখানে কৃত্তিবাসের অঙ্গদ একেবারে লোকভাষায় রাবণকে তীব্র গালি দিয়েছে। বাল্মীকির *রামায়ণ* এ যেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ভরতের সেনাবাহিনীর আমিষ ভোজন আছে, সেখানে বৈষ্ণব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃত্তিবাস ভরতের সেনাদের নিরামিষ ভোজন করিয়েই পরিতৃপ্ত রাখতে চাইলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে মৃত্যুর পর অশরীরী দশরথ এসে পুত্রবধূ সীতার কাছে খাবার খেতে চান। এখানে সীতা বাঙালির সংস্কার মেনে পিণ্ডদান করলেন। আসলে বিধর্মী শাসক ও অত্যাচারী উচ্চবর্ণের জন্য বহু হিন্দু যখন ইসলামে যেতে বাধ্য হয়েছিল, কৃত্তিবাস তখন আরেকবার হিন্দু রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন বোধহয়। কৃত্তিবাসী বিশ্বামিত্র একেবারে বাঙালি ঘরের দীন হীন ছাঁদা বাঁধা ভীত ত্রস্ত বামুন, যা বাল্মীকিতে অনুপস্থিত। বাল্মীকির শাল, কেদার, শিংশপা, সন্তপর্ণ কৃত্তিবাসে কুন্দ, কেতকী, যূথিকা, মালতী। কৃত্তিবাসের স্বরচিত কাহিনিগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— রাম রাবণের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হরপার্বতীর কলহ, অঙ্গদরায়বার, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে বগলদাবা করে মধ্যরাতে উদয় হতে না দেওয়া, হনুভানুর কোলাকুলি, মহীরাবণ অংশ, অহীরাবণ অংশ, রামের দেবী আরাধনা, রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর রামদর্শনে আগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে অবৈধব্য লাভ, মন্দোদরী ও অন্যান্য রাক্ষস রমণীর সীতাকে অভিশাপ দান, গৃধিনী পেচকের দ্বন্দ্ব, হনুমানের বুক চিরে অস্থিময় রামনাম দেখানো ইত্যাদি আরো অসংখ্য। আর কত দৃষ্টান্ত এখানে দেব। কৃত্তিবাস যদি বাল্মীকির অন্ধ অনুকরণ করতেন, তাহলে বাংলার মধ্যযুগের বিশেষভাবে চৈতনয়পূর্ব সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য, লোকাচার, সংস্কার, ব্যবহার, খাদ্যাভাস, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি, মানুষজন ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা অজানা রয়ে যেতাম। আর তা হলে মুদির দোকান থেকে রাজার প্রাসাদ *রামায়ণ* এর এই সর্বজনগ্রহীতা তৈরি হত না। কৃত্তিবাসেই আমরা আলোচনা থামালাম এখানে। কৃত্তিবাস পরবর্তী সময়ের, চৈতন্য পরবর্তী সময়ের ও আধুনিক কালের বাংলায় রামায়ণ পরিগ্রহণ নিয়ে আলোচনার

অবকাশ এখানে আর নেই। আজও যে *রামায়ণ* ভীষণ প্রাসঙ্গিক, *রামায়ণ* সর্বজনগ্রাহ্য তার একটা কারণ বোধহয় ভারতের প্রাদেশিক কবিরা তাদের ভাষায় তাদের সমকালের কথা মাথায় রেখে, যুগের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাল্মীকির রামায়ণ এর পরিগ্রহণ করেছেন, প্রয়োজন অনুসারে তারা বাল্মীকির থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন, বাল্মীকির থেকে উপাদান নিয়ে কখনো বিনির্মাণ করেছেন, অনুসৃজন করেছেন, তাতে প্রাদেশিক রং, বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন এবং তাতে কিন্তু কোনো বিচ্ছেদ তৈরি হয়নি, মূলের প্রতি সম্মানহানিও ঘটেনি, বরং বিভিন্নতার মধ্যেও এক ঐক্যের খোঁজ মেলে তাতে। রামচন্দ্র ওই ব্রাহ্মণ্য ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে 'প্রাকৃত জন' দের মাঝে, 'হরিজন' দের মাঝে তাদের মতো করে নেমে এসেছিলেন বলেই, চণ্ডাল থেকে রাক্ষস সকলকে আপনার করে নিতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো তিনি ব্রাত্য হয়ে যাননি, বরং আবারও রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর একশ একুশ নম্বর কবিতার থেকে ধার নিয়ে তার উদ্দেশে বলা যেতে পারে – 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর/তুমি তাই এসেছ নীচে।/আমায় নইলে ত্রিভুনেশ্বর,/তোমার প্রেম হত যে মিছে।/ . . . তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে/তব আমার হৃদয় লাগি/ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে/প্রভু, নিত্য আছ জাগি।/তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,/তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে,/মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।' রামচন্দ্র আপামর জনসাধারণের। তিনি সকলের আরাধ্য।

উল্লেখপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পুরস্কার,* সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ – ৯৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রামায়ণ,* প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ – ৭১২

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* প্রথম খণ্ড, ২০১৪-২০১৫, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ – ৩৫৫

৪. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য,* ১৯৬১, লেখাপড়া, পৃ – ১৩৫

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রামায়ণ,* প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ – ৭১২, ৭১৩

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রামায়ণ,* প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ – ৭১২

৭. সাহিত্য সংসদ এর রামায়ণ এর ভূমিকায় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা *মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ* শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থঋণ :

- কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অগাস্ট ২০১৮, সাহিত্য সংসদ।
- দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* ২০০৯, সারস্বতকুঞ্জ।
- বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য,* ১৯৬১, লেখাপড়া।
- বুদ্ধদেব বসু, *সাহিত্যচর্চা,* জানুয়ারি ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং।
- সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড, মে ২০১৫, আনন্দ

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মনীতি : বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের আলোকে একটি দার্শনিক সমীক্ষা

রোহিত দাস

সংক্ষিপ্তসার :
'জীবন লইয়া কি করিব?', 'লইয়া কি করিতে হয়?'— এ প্রশ্ন *এবং এই* প্রশ্ন*কেন্দ্রিক চর্চা সুপ্রাচীন*।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *উক্ত* প্র*শ্নের* উত্ত*রে* 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে *বলেছেন,* "সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেদ ও বেদ পরবর্তী নীতিশাস্ত্র গুলি*তে* ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে আলোচিত সুখ, দুখঃ, ধর্ম, মনুষ্যত্ব, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস, ঈশ্বর, প্রীতি, দয়া ইত্যাদি দুরূহ ধারণাগুলি *বিশ্লেষণ* করে *জীবনের এই চরম সত্যে উপনীত হয়েছেন। তিনি* গীতোক্ত ভক্তিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা *এবং একই সঙ্গে* সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্য নীতিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতে আলোচিত নীতি-দর্শনের সামঞ্জস্য বিধানের *ও* চেষ্টা করেছেন*।* শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চার প্রকার বৃত্তির অনুশীলন, স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে *কী*ভাবে ব্যক্তিবিশেষ মনুষ্যত্বের চরম সীমায় উন্নীত হতে পারে, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থ অনুসরণে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান এই গবেষণাপত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়বস্তু।

সূচক শব্দ : ধর্ম, বঙ্কিমচন্দ্র, বৃত্তি, উপাসনা, ভক্তি, দর্শন

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে 'ধর্ম' শব্দটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে কেবল 'Religion' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে নয়, আরো ব্যাপক অর্থে। এই কারণে 'ধর্ম' শব্দের নির্দিষ্ট একটি অর্থে ব্যাখ্যা প্রায় অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সমস্যাকে উপলব্ধি করে ধর্মের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়াস করেছেন তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রচনা। এই গবেষণামূলক নিবন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে

'ধর্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আলোচনাপূর্বক বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে 'জীবন লইয়া কি করিব?', 'লইয়া কি করিতে হয়?'– এ প্রশ্নের উত্তরে 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই'—এই সিদ্ধান্ত বাক্যে উপনীত হয়েছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দ 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' শব্দের অর্থ হল ধারণ করা, সুতরাং 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হল যা ধারণ করে রাখে।[১] ধর্ম হল তা, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে, যা এর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী। অর্থাৎ বলা যায় যে, যদি ধর্মের অভাব থাকত তাহলে জগতে শৃঙ্খলারও অভাব ঘটত।[২]

ভারত ভূখণ্ডের প্রাচীনতম শাস্ত্র হল বেদ। বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে 'ধর্ম' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন অর্থে। প্রাচীনতম বেদ ঋগ্‌বেদে ধর্মকে 'ঋত' ও 'সত্য' বলা হয়েছে। 'ঋত' হল এক অমোঘ নৈতিক নিয়ম যা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী। সূর্য-চন্দ্রের গতিও যার দ্বারা নির্ধারিত হয়, ধর্ম হল সেই নৈতিক নিয়ম ঋতের মতো সত্য। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অয়মেব পরমো ধর্মঃ যদ্যোগেনাত্মদর্শনম'[৩] অর্থাৎ পরম ধর্ম হল যোগকে অবলম্বন করে আত্মদর্শন করা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ধর্মে বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধার্মিকং প্রজা উপসর্পন্তি'[৪] অর্থাৎ ধর্ম হল সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি, প্রজাগণ ধার্মিক মানুষের কাছে নিজের পাপকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে যান। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ধর্ম হল— যা ধারণ করে। উপনিষদে এই ধারক রূপে আত্মা বা ব্রহ্মকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়'[৫] অর্থাৎ যিনি আত্মা তিনি সেতুর মতো সকল লোককে বেঁধে রেখেছেন, যাতে তারা বিচ্ছিন্ন না হয়। সুতরাং আত্মাই হলেন ধারক। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'অস্যৈব প্রশাসনে গার্গী সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্টতঃ'[৬] অর্থাৎ হে গার্গী, তাঁর (ব্রহ্মের) অধীনেই সূর্য ও চন্দ্র নিজের নিজের কাজে ব্যাপৃত হয়ে আছে।

ভারতে ধর্ম সম্বন্ধিত বিস্তারিত আলোচনা যে সকল প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল মনুসংহিতা। এই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'বেদঃ স্মৃতি

সদাচারঃ স্বস্যচপ্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্যলক্ষণং।।'[৭] অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারটি হল ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। ভগবান মনু বেদকে সকল ধর্মের মূল রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বেদোনিখিলোধর্ম্মমূলং"[৮] অর্থাৎ বেদ হল সকল প্রকার ধর্মের মূল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনু দশটি ধর্মের কথা বলেছেন, "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।"[৯] অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ[১০] এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। উক্ত ধর্মসমূহ পালনের মাধ্যমে মানুষ যেমন নৈতিকতার শীর্ষে অবস্থান করতে পারে, তেমনই সমাজে অনুসরণীয়ও হতে পারেন। আচারকে মনু পরম ধর্ম রূপে চিহ্নিত করেছেন– 'আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ'[১১]। মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মের একটি লক্ষণ পাওয়া যায়। লক্ষণটি হল: 'সদাচারঃ স্মৃতির্বেদস্ত্রিবিধং ধর্ম লক্ষণম্ চতুর্থমর্থমিখ্যাহু'[১২] অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতি, সদাচার এই তিনটি ধর্মের লক্ষণ এবং ধর্মের চতুর্থ লক্ষণটি হল প্রয়োজন। মনুর প্রদত্ত লক্ষণের সঙ্গে মহাভারতের এই লক্ষণটি অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের স্বরূপের পরিচয় আমরা পাই কিন্তু শান্তি পর্বে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে এই ধর্ম বিভাগের একটি পরিশীলিত এবং সংযত রূপ পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখিত ধর্মগুলির সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হল।

সার্বভৌম ধর্ম : যে ধর্মগুলি অনুষ্ঠানের ফলে কর্মকর্তা ইহলোকে এবং পরলোকে শান্তি প্রাপ্ত হয় সেগুলি হল সার্বভৌম ধর্ম। এই সার্বভৌম ধর্ম আবার সাধারণ ধর্ম এবং অসাধারণ ধর্ম ভেদে দুই প্রকারের। সাধারণ ধর্ম সমুদয়ের মধ্যে অনৃশংস, অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগ, শ্রাদ্ধকর্ম, আতিথেয়তা, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, সন্তোষ, শৌচ, নিয়ত অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা এই ত্রয়োদশ ধর্ম সর্ববর্ণ এবং সর্বাশ্রম সাধারণ। বিশেষ ধর্মগুলি বর্ণাশ্রম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিগ্রহ, যাজন এবং অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম। কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম এবং সেবা ও পরিচর্যা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম। পরবর্তী বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিচ্ছেদে এপ্রসঙ্গে অধিক আলোচনা রয়েছে।[১৩]

বর্ণাশ্রম ধর্ম : বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম ইন্দ্রিয়দমন, বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দান, যজন,

বেদাধ্যয়ন, প্রজাপালন ও দুষ্টের দমন; তিনি যাজন ও অধ্যাপনা করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদুপায়ে ধনসঞ্চয়, এবং পিতার ন্যায় পশুপালন। প্রজাপতি শূদ্রকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন, তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের ধর্ম। শূদ্র ধনসঞ্চয় করবে না, কারণ নীচ লোকে ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে বশীভূত করে; তবে ধার্মিক শূদ্র রাজার অনুমতিক্রমে ধনসঞ্চয় করতে পারে। শূদ্রের বেদে অধিকার নেই, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা এবং তাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞই শুদ্রের যজ্ঞ।[১৪]

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য— ব্রাহ্মণের এই চার আশ্রম। মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ চতুরাশ্রমের সবগুলি গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্মভ্রষ্ট তিনি বেদচর্চা করুন বা না করুন, তাকে শুদ্রের ন্যায় ভিন্ন পঙ্ক্তিতে খেতে দেওয়া হবে এবং দেবকার্যে বর্জন করা হবে। যে শূদ্র তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক হয়েছে, সে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সদাচারী হয় তবে রাজার অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে।[১৫]

রাজধর্ম : শান্তি পর্বের প্রারম্ভেই ভীষ্ম রাজধর্মের কথা বলেছেন। একজন রাজার কী কী করণীয়, রাজ্যে কার সঙ্গে রাজা কী ধরনের আচরণ করবেন এই সকল বিধান সেখানে প্রদত্ত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ভীষ্ম রাজ্যের সাতটি অঙ্গের কথা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজার মিত্র, দণ্ডনীতি, রাজকর, যুদ্ধনীতি, রাজকোষ এই সকল রাজধর্মের অংশবিশেষ। রাজধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, "যুধিষ্ঠির, সমস্ত জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হয় সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান, তার দ্বারাই চতুর্বর্ণ পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই রাজধর্মের আধারে থাকে। রাজা যদি দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দুর্বল মৎস্যকে ভক্ষণ করে সেইরূপ প্রবল লোকে দুর্বলের উপর পীড়ন করবে। রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না।"[১৬]

আপদ্ধর্ম : রাজধর্ম এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভীষ্ম - যুধিষ্ঠির সংবাদে আপদ্ধর্ম এর কথা উঠে আসে। "যে রাজা অলস ও দুর্বল, যাঁর ধনাগার শূন্য, মন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশীভূত হয়েছে, তিনি অন্য রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হলে কি করবেন?"[১৭] যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম আপদ্ধর্মের বিধান দেন। তবে এই আপদ্ধর্ম শুধু যে আপদ্‌গ্রস্থ রাজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয় বরং সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই আপদ্ধর্মের ব্যাখ্যায় বিশ্বামিত্রের উদাহরণ দিয়ে ভীষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে আপদগ্রস্থ অবস্থায় বিশ্বামিত্র চন্ডালের ঘর থেকে কুকুরের মাংস চুরি করে খেয়েছিলেন এবং তা ধর্ম বলেই পরিগণিত হয়েছিল।[১৮]

মোক্ষ ধর্ম : উপনিষদগুলিতে যে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হল মোক্ষ ধর্ম। মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ এবং এই বন্ধন ছিন্ন হয় মোক্ষপ্রাপ্তির মাধ্যমে। সংসার অসার এই জ্ঞান হলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। অজ্ঞানী মানুষই শুধু শোক করেন। ভীষ্ম রাজা সেনজিত ও ব্রাহ্মণের উপাখ্যান-এর উল্লেখ করে বলেন, জগতে যারা মূঢ়তম এবং যারা পরমবুদ্ধি লাভ করেছে তারাই সুখভোগ করে, যারা মধ্যবর্তী তারা ক্লেশ পায়। যাঁরা রাগদ্বেষাদির অতীত এবং অসূয়াশূন্য হয়ে পরমবুদ্ধিজনিত সুখ লাভ করেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইষ্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ ব্যথিত করে না। আর, যাঁরা পরমবুদ্ধি লাভ করেননি অথচ মূঢ়তা অতিক্রম করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হোক, অপরাজিত (অনভিভূত) হয়ে হৃদয়ে মেনে নেবে।[১৯]

মহাভারতের অংশরূপ হলেও শ্রীমদ্ভগবদগীতা একটি ভিন্ন দার্শনিক মর্যাদা রাখে। গীতায় ধর্ম শব্দটি মূলত নিষ্কাম কর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মযোগ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"[২০] এই স্বধর্ম শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এবিষয়ে সবাই একমত যে ধর্ম শব্দটি এখানে কর্ম ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

ভারতীয় দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় তাদের দার্শনিক আলোচনায় ধর্ম শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ন্যায় দর্শনে ধর্মকে আত্মার একটি গুণ বলা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে ধর্ম হল মহৎ বা বুদ্ধির সাত্ত্বিক পরিণামগুলির একটি। যোগ ভাষ্যে মহর্ষি ব্যাস ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে

বলেছেন, 'সর্বথা-সর্বদা সর্বভূতানাম্ অনভিদ্রুহঃ'[২১] অর্থাৎ ধর্ম সকলের মঙ্গল বা সদিচ্ছা স্বরূপ। মীমাংসা দর্শন সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক লৌগাক্ষি ভাস্কর তাঁর অর্থ সংগ্রহঃ গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণে বলেছেন, 'বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনবদর্থো ধর্মঃ ইতি'[২২] । অর্থাৎ, যা বেদে প্রতিপাদ্য, যার প্রয়োজন আছে এবং যা ইষ্ট উৎপাদন করে তাই হল ধর্ম। যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি হল ধর্ম।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ধর্ম – এই সংস্কৃত শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগুলিতে আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে ধর্ম শব্দের এই বিবিধ ব্যবহার সম্পর্কে পাঠকদের জানান দিয়েছেন। Religion (যেমন হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম), Morality (যা আধুনিক বাংলায় 'নীতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়), Virtue (ধর্মাত্ম মানুষের অভ্যস্ত গুণ), Religion (এক্ষেত্রে নীতি অনুমোদিত কার্য যা পুণ্য নামেও পরিচিত), এছাড়া গুণ (যেমন চুম্বকের লোহা আকর্ষণ) ও আচার – এই ছয়টি অর্থ তিনি উল্লেখ করেছেন।[২৩] প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র গুলির ধর্ম সম্বন্ধিত যে বিস্তারিত ও বিচিত্র ব্যাখ্যা তা সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ-সরল ও নতুন ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং ধর্মতত্ত্বের বিষয় প্রাচীন কিন্তু ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি নতুন। এর সমর্থন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে পাওয়া যায় এইভাবে – "আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না-আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায় তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক-উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য।"[২৪]

'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম' শব্দটি religion অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religion শব্দের অনুরূপ। ধর্ম=ধৃ+মন (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্মকে religion শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।"[২৫] এই Religion সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতামত উল্লেখ করেছেন, এদের

মধ্যে সিলির বক্তব্যটি ("The Substance of Religion is Culture") বিশেষ ভাবে সমর্থন করেছেন। তার এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে তিনি ধর্ম বা Religion শব্দটিকে কেবল শুষ্ক, আচার সর্বস্ব উপাসনা পদ্ধতি রূপে না ব্যবহার করে মানববৃত্তি বা মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র এক সর্বজনীন বৃত্তির অনুসন্ধান করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি দেখিয়েছেন যে সকল মানুষ সুখের সন্ধান করে। মানুষের মনে বদ্ধবিশ্বাস যে ধার্মিক মানুষ সুখী হতে পারে না কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে ধার্মিক হওয়া এবং সুখী হওয়ার মধ্যে কোনো তফাত নেই। সুখ কী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিনী ও চিত্তরঞ্জনী– এই চার প্রকার বৃত্তির কথা বলেছেন[২৬] এবং সমস্ত প্রকার বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতাকেই সুখ বলে নির্দেশ করেছেন। বৃত্তি শব্দটিকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্তি বলতে এখানে ইংরেজি faculty শব্দটিকে নির্দেশ করেছেন। বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি এবং সামঞ্জস্য বিধানের উপায় রূপে তিনি অনুশীলন কে চিহ্নিত করেছেন। সকল বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি রূপে তিনি ভক্তি বৃত্তিকে চিহ্নিত করেছেন। এই ভক্তি বৃত্তি হল বঙ্কিচন্দ্রের মতে ধর্মের উৎকৃষ্ট রূপ। বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থায় ভক্তি।'[২৭]

বৈদিক ধর্মে বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তির অভাবকে নির্দেশ করেছেন, তাঁর মতে, "সাধারণ উপাসকদের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে রূপ সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্য উপাসকদের সেই সম্বন্ধ ছিল।"[২৮] এই প্রকার উপাসনাকে তিনি কাম্য কর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। এরপর তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও সাংখ্য নিরীশ্বরবাদের সমালোচনা করেছেন। জ্ঞানবাদের অসম্পূর্ণতা ব্যাখ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। [২৯]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে ধর্মের কথা বলেছেন সেই ধর্ম হল অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন। সৃষ্টিকর্তার জাতি স্বীকার করা অর্থহীন। তাই ঈশ্বর উপাসনা পদ্ধতিকে সর্বজনীন হতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করলেও তার আচারসর্বস্ব দিকগুলির সমালোচনা

করেছেন। তাই আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন, "উপাসনা-তত্ত্বের সারমর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।"[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় কর্ম, জ্ঞানকে উপেক্ষা না করেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপাদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এও প্রতিপাদন করেছেন যে, ভক্তিমার্গ অপেক্ষাকৃত কঠিন হলেও সেই ভক্তি মার্গ অবলম্বন কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই অসম্ভব নয়। পরিশেষে বলতে পারি যে পূর্ব উল্লেখিত বঙ্কিমচন্দ্রকৃত আক্ষেপের সদর্থক দিকটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং সেই পরম রমণীয় উপাসনা তত্ত্বের সুসারকে উপলব্ধি করে মানবজীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে; যার বীজ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নিহিত আছে।

তথ্যসূত্র :

১। *নীতিবিদ্যা,* ডঃ দীক্ষিত গুপ্ত, পৃ. ৬
২। "*ভারতীয় দর্শন ও তার পটভূমিকা*", গোপীনাথ ভট্টাচার্য, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪
৩। *ভারতীয় ধর্মনীতি,* অমিতা চাটার্জী, পৃ. ২৯
৪। ওই
৫। *ছান্দোগ্য উপনিষদ* – ১/৪/১
৬। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* – ৬/৮
৭। *মনুসংহিতা* – ২/১২
৮। *মনুসংহিতা* – ২/৬
৯। *মনুসংহিতা* – ৬/৯২
১০। সরলর্থ—ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), দম (সৎ আচরণ), অন্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান)
১১। *মনুসংহিতা* – ১/১০৮
১২। শান্তিপর্ব, *মহাভারত*
১৩। *মহাভারতের ধর্ম,* সাধুচরণ মজুমদার, পৃ. ১
১৪। *মহাভারত সারানুবাদ,* রাজশেখর বসু, পৃ. ৫৮২

১৫। ওই, পৃ. ৫৮৩
১৬। ওই
১৭। *মহাভারত সারানুবাদ*, রাজশেখর বসু, পৃ. ৫৮৬
১৮। ওই, পৃ. ৫৯০
১৯। ওই, পৃ. ৫৯০
২০। শ্রীমদ্ভগবদগীতা— ৩/৩৫
২১। ব্যাসভাষ্য, যোগসূত্র – ২/৩০
২২। অর্থ সংগ্রহঃ, লৌগাক্ষি ভাস্কর।
২৩। ধর্ম্মতত্ত্ব , বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ- ১৪২
২৪। ওই, পৃ. ৬৪
২৫। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* ড. এম. মতিউর রহমান, পৃ. ৩৬
২৬। *ধর্ম্মতত্ত্ব ,* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২০
২৭। ওই, পৃ. ৬১
২৮। ওই, পৃ. ৬৫
২৯। ওই, পৃ. ৬৭
৩০। ওই, পৃ. ১৮

গ্রন্থপঞ্জি :

- গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত), *উপনিষদ গ্রন্থাবলী (২য়, ৩য় খণ্ড),* উদ্বোধন কার্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৭
- গুপ্ত, ডঃ দীক্ষিত, *নীতিবিদ্যা,* শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৪
- ঘোষ, শ্রীজগদীশচন্দ্র, *শ্রীগীতা,* প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ৪৬তম সংস্করণ, কলকাতা, মার্চ ২০১৮
- চক্রবর্তী, জয়ন্ত (সম্পাদিত), *মনু সংহিতা,* সঞ্চয়ন প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্ম্মতত্ত্ব,* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
- মজুমদার, সাধুচরণ, *"মহাভারতের ধর্ম"* (গবেষণা পত্র), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০
- চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদিত), *ভারতীয় ধর্মনীতি,* এলাইড পাবলিশার্স সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, জুন ১৯৯৮

- বসু, রাজশেখর, *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত সারানুবাদ*, নিউ লতিকা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
- বেদান্তবাদীশ, কালীবর (সম্পাদিত), *পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ পরিশিষ্ট*, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা ১২৯১ বঙ্গাব্দ
- ভর্গানন্দ, স্বামী (অনূদিত ও সম্পাদিত), *অর্থ সংগ্রহঃ*, লৌগাক্ষি ভাস্কর, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৪১১ বঙ্গাব্দ
- রহমান, ড. এম. মতিউর, *শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, জুলাই ২০১২

দলিল-দস্তাবেজের পুথিচর্চা : বাঙালির এক অনালোচিত অধ্যায়

শুভাশিষ গায়েন

দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র বাংলা পুথির অন্তর্গত। পুথি যেমন সামাজিক ইতিহাসের দলিল, তেমনি বাংলা ভাষার উৎস অনুসন্ধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একইভাবে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলা গদ্যের আদি রূপ। শুধু তাই নয় দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেও সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে এবং এগুলি বাংলা ভাষাচর্চার একটি অনস্বীকার্য উপাদান। আমাদের আলোচ্য দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের পুথিগুলি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ১৩০৬ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই চর্চার ধারাটি হল—

ক্রমিক সংখ্যা	প্রবন্ধের নাম	প্রাবন্ধিক	বর্ষ	প্রকাশকাল
১	একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	০৬	চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৬
২	আর একখানি প্রাচীন দলিল	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	০৮	প্রথম সংখ্যা, ১৩০৮
৩	মহারাজা নন্দকুমারের পত্র	নিখিল রায়	১০	প্রথম সংখ্যা, ১৩১০
৪	শালগ্রাম বন্ধকের দলিল	চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৪০	প্রথম সংখ্যা, ১৩৪০

সমগ্র আলোচনায় তিনটি দলিল ও একটি চিঠিপত্রের চর্চা হয়েছে। আমরা প্রথমে তিনটি দলিল সম্পর্কে আলোকপাত করব। তারপর একটি চিঠি নিয়ে আলোচনা হবে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রথম দলিল-দস্তাবেজচর্চা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩০৬ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় 'একখানি প্রাচীন দলিল' শীর্ষক আলোচনায়। তিনি এই প্রাচীন দলিলটির কথা শুনেছিলেন বন্ধু ক্ষেত্রগোপাল গুপ্তের কাছ থেকে। তাঁর সংগৃহীত দলিলটি মূল দলিলের অনুলিপি মাত্র। মূল দলিলটি রাধামোহন ঠাকুরের বংশধরদের কাছে মালিহাটী গ্রামে রক্ষিত আছে। তিনি মালিহাটীর নিকটবর্তী টেঁরা গ্রামের নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে মূল দলিলের অনুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। দলিলের তারিখ ১১২৫ সন, ১৭ ফাল্গুন। দলিলের বিষয়বস্তু হল— জয়পুরের মহারাজা সেওয়াই জয়সিংহের সভায় কয়েকজন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে জয়পুরের পণ্ডিতদের ধর্মসংক্রান্ত বিচার হয়। স্বকীয়া ভজন ও পরকীয়া ভজনের মধ্যে কোনটি বিস্তৃত তা এই বিচারের বিষয়। জয়পুরের বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ স্বকীয়া ভজনের পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলাদেশের বৈষ্ণব পণ্ডিতরা পরকীয়া ভজনের পক্ষপাতী ছিল। এই বিতর্ক যুদ্ধে বাঙালি বৈষ্ণবরা পরাজয় স্বীকার করেন। পরে তাঁদের অনুরোধে মহারাজা জয়সিংহের সভায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যকে বাংলাদেশ আসার অনুরোধ করেন। বাঙালি পণ্ডিতরা কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্যগণকে আহ্বান করেন বিচারক হিসেবে। নবাব জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি খাঁ) বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর অনুমতি অনুসারে সম্ভবত এই বিচার হয়। এই বিচার অনুসারে পরকীয়া মত অবলম্বনকারী বাঙালি বৈষ্ণবরা জয় লাভ করে। জয় লাভের পর যে সকল বাঙালি পণ্ডিত জয়পুরে পরাজিত হয়ে স্বকীয়া মত অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল, তারা বাংলায় পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবগণের পঞ্চ পরিবার থেকে খারিজ হয়ে ইস্তফা পত্র লিখে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দলিলের সাক্ষীগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়াও কয়েকজন মুসলমান রাজকর্মচারীর নাম আছে। সম্ভবত তাঁরা নবাবের দ্বারা নিযুক্ত। দলিলে নবাব ও নবাবের কর্মচারীদের মোহরযুক্ত স্বাক্ষর ছিল। ডাহাপাড়া মহিমাপুর মুর্শিদাবাদের কাছেই। নবাব ও তার কর্মচারীদের নাম থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনুমান করেন যে, এই বিতর্কসভা নবাবের দরবারেই হয়েছিল।[১] শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর বাঙালিদের পক্ষে অধ্যক্ষ ছিলেন। ওই বিচার সভায় রাধামোহন ঠাকুরের

সঙ্গে তাঁর শিষ্য টেঁরা গ্রামের গোকুলানন্দ সেন এবং কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, এই রূপ জনশ্রুতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শুনেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি 'পদকল্পতরু'-র সংকলনকর্তা। 'পদকল্পতরু'-তে তাঁরা বৈষ্ণবদাস এবং উদ্ধব দাস নামে পরিচিত।

এই দলিলের শুরুতে আছে 'শ্রীশ্রীহরি শরণং' তারপরেই কয়েকজন মুসলমান কর্মচারীর স্বাক্ষর এবং কয়েকজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। তারপর দলিলের শুরু হয়েছে। দলিলের শুরুর অংশটি এইরূপ— "লিখিতং শ্রী রামানন্দ দেবস্য তথা শ্রীরাঘবিন্দ্র দেবস্য তথা শ্রীপঞ্চানন্দ দেবস্য তথা শ্রী আত্যারাম দেবস্য শ্রীবল্যবিকান্ত দেবস্য তথা শ্রীমদনমোহন দেবস্য শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবস্য ও গয়রহ ইস্তফাপত্রমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে সন ১১২৫ সাল আমার শ্রীশ্রী৺ গিয়া সওাই জয়শীংহ মহারাজা মহাসয় শ্রীশ্রী৺ তিনলক্ষ বর্ত্তিষহাজার ভাগবত সান্ত গ্রন্থ্ করিয়াছিলেন তাহার ১ এক লক্ষ গ্রন্থ্ শ্রী৺ জমুনায় সমার্পন করিআছিলেন বাকী এক লক্ষ গ্রন্থ্ শ্রীশ্রী৺পদ্মাসনে গচগীরি গারা ছিল বাকী এক লক্ষ বর্ত্তিষ হাজার গ্রন্থ্ শ্রী৺ গাদিতে আছিল তাহার গাদিয়ান একমৎ শ্রী৺ আছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলেচ্ছে শ্রীমন্দীরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছের ভয়ে শ্রীশ্রী৺ জয়নগরে গেলেন পদাসন খুদিয়া সেই এক লক্ষ গ্রন্থ্ আনীয়া মহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনীয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্বামী আনীয়। সেইসফল গ্রেন্থ্ বিচার করিয়া সকিয়াধর্ম্ম প্রেধান করিয়াছিল। সকলে কহিলেন সকিয়াধর্ম্ম স্থাহি শ্রীশ্রী৺ স্থানে সকীয়াধর্ম্ম প্রেকাষ করিবেন এবং আমাদির্গে কহিলেন তোমরাহ সকীয়া ধর্ম্ম জাজন করহ এবং নতুবা বিচার করহ তাহাতে দেব প্রণিত বিচারে সকীয়া স্বাহি করিলেন আমরা পরকিয়ামৎ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া সকীয়ায় দন্তখত করিয়াছিলাম পরে আমরা কহিলাম গৌর দেশে শ্রীশ্রী৺ প্রভুর পদাঙ্কীত স্থান সেখানে শ্রীশ্রী৺ ভাগবত সান্তি আছেন এবং সভাসতস্থান আছেন তাহারা মহাপাধ্যয় বিচার হইবেক গোড়ে পরকিয়া ধর্ম্মের অধিকারী তাহারা সকীয়াধর্ম্ম লবে কেন এখানে জেমৎ সভাসদ হইল গৌরদেশে অনেক সভাসত আছে বিচার করিবেক..."[২] আলোচ্য দলিলটি গদ্যে রচিত। দলিলের কোথাও দাড়ি, কমা, পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়নি। সমান্তরালভাবে লিখিত হয়েছে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় অপর একটি প্রচীন দলিল সম্পর্কে আলোকপাত করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩০৮ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায় 'আর একখানি প্রাচীন দলিল' শীর্ষক আলোচনায়। এই দলিলটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দে উল্লেখিত দলিলের ঘটনা অবলম্বন করে লিখিত। আলোচ্য দলিল সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অভিমত —

> ১৩০৬ সালের চতুর্থ সংখ্যক 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গিয়াছিল। নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানিও সেই একই ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পত্র দুই খানির তারিখে কিছু তফাৎ আছে। সে খানার তারিখ ১১২৫ সাল ৫ই ফাগুন; এখানির তারিখ ১১৩৮ সালে বৈশাখ। স্বাক্ষরকারী ও সাক্ষীর নামে কতক কতক তফাত আছে।[৩]

এই দ্বিতীয় পত্রটি জেমো(কান্দি) বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা শ্যামসুন্দর ঘোষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দলিলের শুরুতে — 'শ্রীশ্রী হরি' দিয়ে শুরু হয়েছে। তারপর 'শ্রীশ্রী মদন গোপাল জিউ', 'শ্রীশ্রী গোবিন্দ জিউ', 'শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউ', 'শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'সধর্মান্বিত শ্রীল শ্রী রাধামোহন ঠাকুর' প্রভৃতি স্মরণ করে দলিল লিখিত হয়েছে।[৪] দলিলটির মূল বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে তারপর থেকে। বৈষ্ণবদের স্বকীয়া ও পরকীয়া ধর্ম পালন নিয়ে যে সংবাদ শুরু হয়েছিল তার মীমাংসা করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এই দলিলটি গদ্যে লিখিত হলেও কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।

চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সারা ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভাঙনের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন এই দলিলটি। এই দলিলের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

- **শালগ্রাম বন্ধকের দলিল**

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় শালগ্রাম বন্ধকের দলিল সম্পর্কে আলোকপাত করেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৩৪০ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায়। এই দলিল সম্পর্কে তিনি জানান— "পুরাণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত এ নানারকম দলিল (আত্মবিক্রয় পত্র, মনুষ্য বিক্রয় পত্র প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি

আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডের একখানি পুথিতে এক নতুন রকমের দলিলের নকল পাইয়াছি।”[৫] ‘স্কন্দপুরাণ’-এর উৎকল খণ্ড ১৬০৬ শকাব্দে জনৈক রামেশ্বর লিখেছিলেন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন— “দলিলের নকল কিন্তু অন্যহাতে এবং পরবর্তী যুগে লেখা। তবে মূল দলিল খানি ও আমাদের পুঁথি প্রায় সমসাময়িক। দলিলের তারিখ ১০৯৬ বঙ্গাব্দ।”[৬]

দলিলদাতা রামচন্দ্র শর্মা রামেশ্বর সেনের কাছে পৈত্রিক দুটি শালগ্রাম শিলা বন্ধক রেখে দু’টাকা নিয়েছিলেন। তাতে তাকে ধার হিসেবে কিছু দিতে হয়নি। শালগ্রাম শিলা বন্ধকের সম্পর্কে দলিলটি লিখিত হয়েছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দলিলটির গুরুত্ব অপরিসীম।

- **মহারাজা নন্দকুমারের পত্র**

নন্দকুমার ছিলেন নবাবী আমলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের দেওয়ান। তিনি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাছ থেকে বর্ধমান, নদিয়া এবং হুগলির দেওয়ানি লাভ করেন। ১৭৬৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন বর্ধমান, নদিয়া ও হুগলী জেলার কালেক্টর। বিভিন্ন জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়সহ মীরজাফরের স্ত্রীর কাছ থেকে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণের বিষয় প্রকাশ পাওয়ায় এবং ঘুষখোর, স্বৈরাচারী, নিষ্ঠুর ও অসাধু হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার নানা অভিযোগ আনে। ফলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী তাকে পদচ্যুত করে ইংল্যান্ডে ফেরৎ পাঠায়। তার স্থলাভিসিক্ত হন নন্দকুমার। নন্দকুমারের সততায় মুগ্ধ হয়ে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম তাকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন হেস্টিংস। কিন্তু তখন তিনি কিছু করতে পারেননি। কারণ লর্ড ক্লাইভ নন্দকুমারকে স্নেহ করতেন। পরে অবশ্য বিভিন্ন দেশীয় রাজার সঙ্গে নন্দকুমারের গোপন পত্র বিনিময়ের কথা জানতে পেরে সেই সম্পর্ক তিক্ত হয়। তবু সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু নন্দকুমার ক্রমশ একজন নির্ভীক, সৎ এবং জনহিতৈষী ব্যক্তি বলেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়েই এল সেই জালিয়াতির মামলা। মহারাজা নন্দকুমারের নামে গঙ্গাবিষ্ণু নামে এক ব্যক্তি জালিয়াতির অভিযোগ করেন।

নবাব মীরকাশিমের আমলে বেলকি দাস জহুরীর একটি মুক্তার হার, একটি কলকা, একটি শিরপেচ এবং চারটি হীরের আংটি বিক্রি করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় কাশেমবাজার লুঠ হওয়ায় বেলকি দাসের নিজের জিনিসের সঙ্গে এগুলিও লুঠ হয়ে যায়। অতঃপর বেলকি দাস নন্দকুমারকে চার হাজার একুশ টাকা পরিশোধ করবেন বলে অঙ্গীকারপত্র লিখে দেন। সেইসঙ্গে চার শতাংশ হারে সুদ দেবেন বলেও জানান। বেলকি দাসের মৃত্যুর পর পদ্মমোহন দাস সেই টাকা পরিশোধও করেন। কিন্তু পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর বেলকির এক আত্মীয় গঙ্গাবিষ্ণু সেই টাকার হিসাব নিয়ে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। নন্দকুমার তখন তাঁর কাছে থাকা অঙ্গীকারপত্রের জোরে মুক্তি পান। ঠিক এই সময় ১৭৭৩ সালে হেস্টিংস আবার কলকাতায় এলেন। এবার তিনিই গভর্নর জেনারেল। সেইসঙ্গে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কলকাতায় তৈরি হল হাইকোর্ট। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্ররোচনায় গঙ্গাবিষ্ণু আবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে। সে প্রমাণ করতে চায় নন্দকুমারের ওই অঙ্গীকারপত্রটি জাল। শেষ পর্যন্ত হেস্টিংসের সাহায্যে প্রমাণিত হয় নন্দকুমার জাল অঙ্গীকার পত্র দাখিল করেছে। এই জালিয়াতির মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৫ আগস্ট প্রকাশ্য রাস্তার পাশে তাঁর ফাঁসি হয়।[৭]

নন্দকুমারকে লিখিত একটি পত্র সম্বন্ধে ১৩১০ বঙ্গাব্দে নিখিলনাথ রায় ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র প্রথম সংখ্যায় ‘মহারাজা নন্দকুমারের পত্র’ শীর্ষক আলোচনায় একটি ঐতিহাসিক পত্রের আলোচনা করেন। তিনি এই পত্রটি সংগ্রহ করেছিলেন মহারাজা নন্দকুমারের বংশধর কুঞ্জঘাটার কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে। এই চিঠিটি কে লিখেছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এই পত্রটির বিষয়বস্তু হল কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি যিনি মহারাজা নন্দকুমারের হিতাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি মহারাজা নন্দকুমারকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করার জন্য পত্রটি লিখেছেন। এই পত্রটিতে বেশকিছু তারিখের উল্লেখ থাকলেও কোন সালের উল্লেখ নেই। পত্রটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

শ্রীশ্রী হরিঃ শরণং

প্রাণাপ্রতিমেষু পরমশুভাশীব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ :—

> তোমার মঙ্গল সর্বদা বাসনাকরনক অত্র কুশল পরন্তুঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁএর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁচেন নাই পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা ২ জাউন ফলত কার্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতে ছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক ...[৮]

পত্রের শেষ অংশটি হল —

> সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রটন্তি চতুর্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাথ রায়কে এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পহুচে নাঞি দাখিল হইলে তাঁহার চলন মাফিক ব্যবহার হবে শ্রীযুত মিশুর মেদলটীন সাহেবকে জে খত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্ধ না দিয়া মন্থর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্ধ দিয়া বন্দ করিয়া তাহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গল বার্ত্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা কিমধিক ইতি[৯]

এই পত্রটি তাঁর ফাঁসির পূর্বে লিখিত। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী অজ্ঞাত কোন এক ব্যক্তি লিখেছেন এই পত্রটি। অবশ্য তাঁর বিরূদ্ধে যে একটি চক্রান্ত চলছিল তা চিঠিটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

একথা স্পষ্ট বোঝা যায়, বাঙালির গদ্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র থেকে। তবে এই গদ্য আধুনিক গদ্য নয়। যতি চিহ্নের ব্যবহার সেই অর্থে এই দলিল-দস্তাবেজে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় না। মহারাজা নন্দকুমারের চিঠি কিংবা শালগ্রাম বন্ধকের দলিল থেকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের কিছু অজ্ঞাত বিষয় উঠে আসে। মনুষ্য বিক্রয় কিংবা আত্মবিক্রয় পত্রের কথা প্রাচীন পুথিপত্রের মধ্যে পাওয়া গেলেও শালগ্রাম শিলা কিংবা কুলদেবতাকে বন্ধক রাখার কথা বিশেষ জানা যায় না। ইংরেজ শাসনাধীন বাংলাদেশে বাঙালির দুরবস্থার চিত্র দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র থেকে উঠে আসে।

সূত্র নির্দেশ :

১. *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*; ১৩০৬ বঙ্গাব্দ; চতুর্থ সংখ্যা; সম্পাদক - রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; প্রবন্ধ – ‘একখানি প্রাচীন দলিল’; প্রাবন্ধিক - রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; কলকাতা; পৃষ্ঠা - ২৯৮

২. তদেব; পৃষ্ঠা - ২৯৯-৩০০

৩. *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*; ১৩০৮ বঙ্গাব্দ; প্রথম সংখ্যা; সম্পাদক - রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; প্রবন্ধ – ‘আর একখানি প্রাচীন দলিল’; প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; কলকাতা; পৃষ্ঠা – ৮

৪. তদেব; পৃষ্ঠা - ৯

৫. *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*; ১৩৪০ বঙ্গাব্দ; প্রথম সংখ্যা; সম্পাদনা - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; প্রবন্ধ – ‘শালগ্রাম বন্ধকের দলিল’; প্রাবন্ধিক – চিন্তাহরণ চক্রবর্তী; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; কলকাতা; পৃষ্ঠা - ৪২।

৬. তদেব; পৃষ্ঠা - ৪২

৭. *মহারাজা-নন্দকুমার-চরিত*; সত্যচরণ শাস্ত্রী; কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত, কলকাতা; ১৩০৫ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ২১২

৮. *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*; ১৩১০ বঙ্গাব্দ; প্রথম সংখ্য; সম্পাদক - রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; প্রবন্ধ – ‘মহারাজা নন্দকুমারের পত্র’; প্রাবন্ধিক - নিখিলনাথ রায়; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; কলকাতা; পৃষ্ঠা - ৬৩

৯. তদেব; পৃষ্ঠা – ৬৫

ড. সুকুমার সেনের দৃষ্টিতে সিলভ্যাঁ লেভির প্রাচ্যতত্ত্ব-সাধনা

ড. অমৃতা ঘোষাল

এক ইতিহাসবেত্তাই কী অন্য এক ইতিহাস-নির্মাতার জীবনদর্শনকে অনুভব করতে পারেন? ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেনের রচনাবিশ্বকে আত্মস্থ করলে এর উত্তর অবশ্যই মিলবে। সমালোচনার নেতিবাচকতা কখনও সুকুমার সেনের রচনাকে ছায়াবৃত করেনি। বরং জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু পাঠককে দেখিয়েছে ভাবনাকে উর্বরতর করে তোলার বিশ্বস্ত পন্থা। সারস্বত-সাধনায় ব্রতী সুকুমার অন্যান্য জ্ঞান-তপস্বীর কাছে তাঁর কৃতাঞ্জলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব লেখনীর সুচারু ভঙ্গি কিংবা কোনো ভাষণের উপস্থাপনায়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সিলভ্যাঁ লেভির অগাধ জ্ঞানবারিধি সুকুমার সেনের কাছে যে অবশ্যই প্রণম্য, তা সুকুমার-প্রস্থানের সঙ্গে পরিচিত সহৃদয় মাত্রেই অনুভব করবেন। নিজেকে 'হোম বেকড স্কলার'-বলা সুকুমার সেনের মনের এককোণে সম্ভবত দুঃখ ছিল যে তিনি অ্যাকাডেমিক কারণে কখনও বিদেশ যেতে পারেননি। কিন্তু বিদেশি জ্ঞানতাত্ত্বিকরা এদেশে গবেষণাসূত্রে এলে একটুও অসূয়া-বোধ না করে তাঁর সান্নিধ্য পেতে উৎসাহী হয়েছেন। আসলে, জ্ঞানই যে প্রকৃত বোধির সন্ধান দেয়! আর সেই বোধির চর্যায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত সুকুমার সেন। স্মর্তব্য গীতার সেই অমোঘ শ্লোক—

> সর্বভুতেষু যেন একম্ ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষ্যতে।
> অবিভক্তম বিভক্তেষু তত্ জ্ঞানম্ বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।[১]

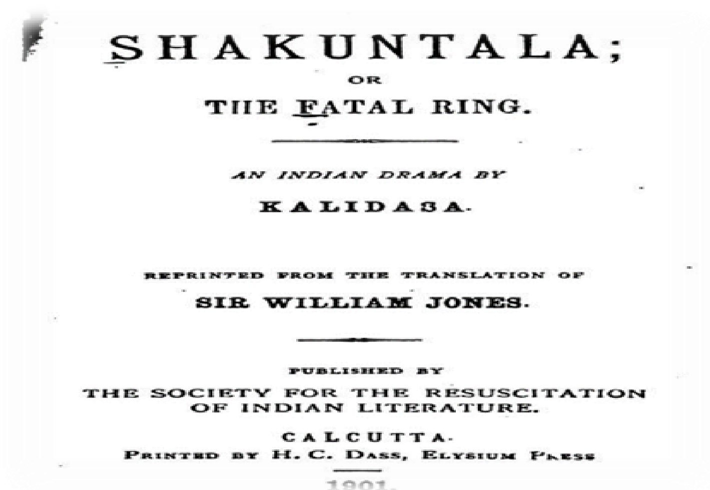
অর্থাৎ, যে জ্ঞানের দ্বারা এক অবিভক্ত চিন্ময়-ভাব দর্শন হয় কিংবা রূপগত ভিন্নতা থাকলেও সমস্তটাই চিন্ময় সত্তায় এক— এই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। তাই সুকুমারের উপলব্ধিতে জ্ঞানের একটা 'universalized' আবেদন

ছিল, যা স্থান-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করেও এক চিরন্তন সত্যকে বাঁচিয়ে রাখে।

সংস্কৃত ভাষাকে সংরক্ষণের প্রবণতা বাংলা ভাষার ইতিহাসে আধুনিক যুগের ঊষালগ্নে পরিলক্ষিত হয়েছিল দুইভাবে।

- প্রথমত, সংস্কৃত সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস।
- দ্বিতীয়ত, বিদেশি পণ্ডিতদের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন।

প্রথমটির আলোচনা বিশদে করেছেন সুকুমার তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ বইটির প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ডে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি যেন কোলাজ-চিত্রের ন্যায় প্রকট হয়েছে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধে। সিলভ্যাঁ লেভীকে নিয়ে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা, ‘সংস্কৃত সাহিত্য সাধক : সিলভ্যাঁ লেভী’ (বেতারভাষণ - ১৯৫৪, প্রথম প্রকাশ *বাল্মীকি* পত্রিকা-১৯৮১)-তে সেই আঠেরো শতকের সংস্কৃত চর্চার ইতিহাসটি ফুটে উঠেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যাঁর নাম ওতপ্রোত জড়িত সেই স্যার উইলিয়াম জোনসের (১৭৪৬-১৭৯৪) অনুবাদক-সত্তাকে প্রথমেই তুলে ধরেছেন। উল্লেখ করেছেন জোনস উইলকিনস আর কোলব্রুকেরও। কারণ বাংলায় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় এঁদের অবদান অসীম।


SHAKUNTALA;
OR
THE FATAL RING.

AN INDIAN DRAMA BY
KALIDASA.

REPRINTED FROM THE TRANSLATION OF
SIR WILLIAM JONES.

PUBLISHED BY
THE SOCIETY FOR THE RESUSCITATION
OF INDIAN LITERATURE.

CALCUTTA.
PRINTED BY H. C. DASS, ELYSIUM PRESS
1901.

স্যার উইলিয়াম জোনস অনূদিত শকুন্তলা



THE
BHĂGVĂT-GEETĀ,
OR
DIALOGUES
OF
KRĔĔSHNĂ AND ĂRJŎŎN;
IN EIGHTEEN LECTURES,
432133 WITH
NOTES.

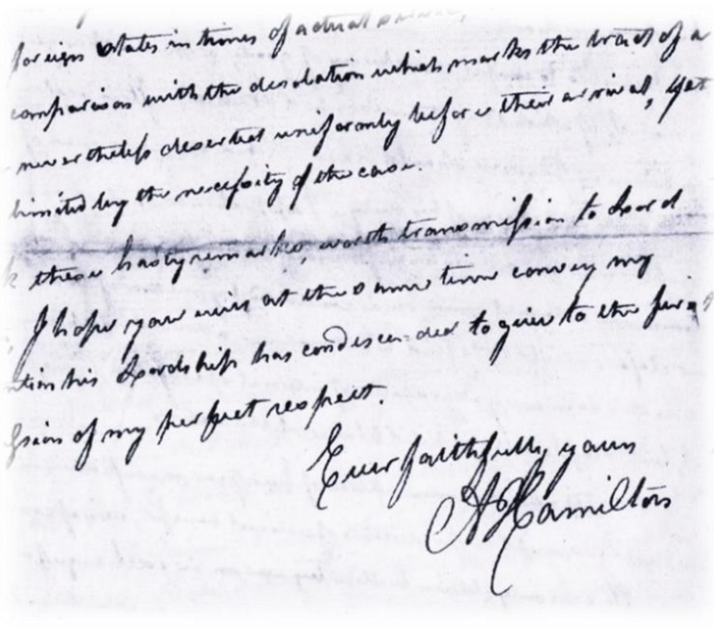
TRANSLATED FROM THE ORIGINAL, IN THE *Sănskrĕĕt*, OR ANCIENT LANGUAGE OF THE *Brāhmăns*,
BY
CHARLES WILKINS,
SENIOR MERCHANT IN THE SERVICE OF THE HONOURABLE THE EAST INDIA COMPANY, ON THEIR BENGAL ESTABLISHMENT.

LONDON:
PRINTED FOR C. NOURSE,
OPPOSITE CATHARINE-STREET, IN THE STRAND.
MDCCLXXXV.

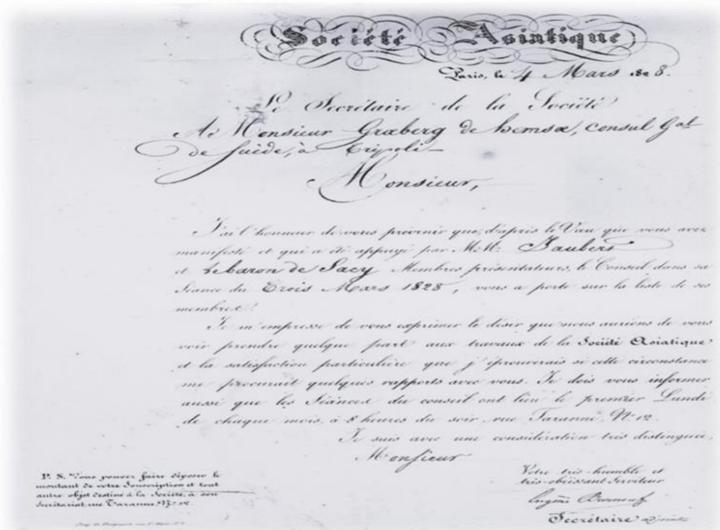
চার্লস উইলকিনস অনূদিত ভগবদ্গীতা

প্রাচ্যের সম্পদ ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বিশ্বের দরবারে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। কালিদাসের আলঙ্কারিক আবেদন আর এ দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না। প্রাচ্যকে ক্রমশ চেনার সুযোগ পেল প্রতীচ্য। একেবারে অ-চর্চিত এক নাম তুলে আনলেন সুকুমার— তিনি হলেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন (১৭৬২-১৮২৪)। হ্যামিলটন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক হয়েও সম্ভবত বঙ্গকে ভালোবেসেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, আবার বিবাহও করেছিলেন বঙ্গরমণীকে। তিনিই ইউরোপীয় গবেষকদের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে জানাতে আরম্ভ করেন। হ্যামিলটনের বিদ্যা প্রাচ্যের ভাষাকে অবশ্যই স্পর্শ করেছিল, তবে সংস্কৃতিগত উৎসের গভীরে কখনোই পৌঁছতে পারেনি। তবু একথা স্বীকার্য যে তাঁর সংস্কৃত-প্রীতি ও চর্চা এ ব্যাপারে বেশ কিছু উত্তরসাধকের জন্ম দিয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখ্য অবশ্যই এজেন বুর্নুফ (১৮০১-১৮৫২)। সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞান রেখে রীতিমতো চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিলেন এজেন। ভাগবত পুরাণ থেকে বৌদ্ধিক সাহিত্য— প্রাচ্যভাষার এই বিস্তৃত ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। এরপর তাঁরই দেখানো পথকে আরো সুগম করে

তোলেন ফ্রান্সের ইন্ডোলজিস্ট আবেল রেয়ার গাঞ (Abel Henri Joseph Bergaigne , ১৮৩৮-১৮৮৮)। আবেলের স্পষ্ট ভাবনার আলোয় বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভির মানসপট। বৈদিক চর্চার নির্যাসটুকু পরম উৎসাহে গুরুপ্রতিম আবেলের থেকে গ্রহণ করেছিলেন সিলভ্যাঁ। আর এ দেশীয় অলংকারশাস্ত্রর বৈজ্ঞানিক প্রকরণ নিয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন দু'জনেই। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন সুকুমার। তাই গুরু-শিষ্যর সম্পর্ক যে দাতা-গ্রহীতার সমীকরণের বাইরেও কিছু উল্লেখযোগ্য সূত্র তৈরি করতে পারে, তা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছিলেন সুকুমার। তাই, সিলভ্যাঁর সামগ্রিক জ্ঞানবিশ্বকে তুলে ধরার আগে তাঁর পূর্বসূরীদেরও প্রণিধান জানিয়েছেন যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গেই। যেকোনো বিখ্যাত ব্যক্তির খ্যাতি-অর্জনের আগে একটা সলতে পাকানোর ইতিহাস থাকে। সেই ইতিহাসটুকুই জ্ঞানসাধনার নির্ভেজাল অনুপ্রেরণা।


foreign States in times of actual ...
comparison with the desolation which marks the track of a
nevertheless deserted uniformly before their arrival, yet
limited by the necessity of the case.
these hasty remarks, worth transmission to Lord
I hope your mind at the same time convey my
tion his Lordship has condescended to give to the for...
pain of my perfect respect.
Ever faithfully yours
A Hamilton

আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের স্বাক্ষর



Société Asiatique

Paris, le 4 Mars 1828.

Le Secrétaire de la Société

A Monsieur Græberg de Hemsø, consul Gal de Suède, à Tripoli —

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous prévenir que, d'après le Vœu que vous avez manifesté et qui a été appuyé par MM. Jaubert et le baron de Sacy Membres présentateurs, le Conseil dans sa Séance du Trois Mars 1828, vous a porté sur la liste de ses membres.

Je m'empresse de vous exprimer le désir que nous aurions de vous voir prendre quelque part aux travaux de la Société Asiatique et la satisfaction particulière que j'éprouverais si cette circonstance me procurait quelques rapports avec vous. Je dois vous informer aussi que les Séances du conseil ont lieu le premier Lundi de chaque mois, à 8 heures du soir, rue Taranne, N° 12.

Je suis avec une considération très distinguée,

Monsieur

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur

Eugène Burnouf

Secrétaire adjoint

P. S. Vous pouvez faire déposer le montant de votre Souscription et tout autre objet destiné à la Société, à son Secrétariat, rue Taranne N° 12.

এজেন বুর্নুফের স্বাক্ষর



ASAṄGA.

MAHĀYĀNA-SŪTRĀLAṂKĀRA

EXPOSÉ DE LA DOCTRINE DU GRAND VÉHICULE

SELON LE SYSTÈME YOGĀCĀRA

ÉDITÉ ET TRADUIT

D'après un manuscrit rapporté du Népal

PAR

SYLVAIN LÉVI

PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE

DIRECTEUR D'ÉTUDES A L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES

TOME I. — TEXTE

PARIS

LIBRAIRIE HONORÉ CHAMPION, ÉDITEUR

5, QUAI MALAQUAIS

1907

Tous droits réservés

Cet ouvrage forme le fascicule 159e de la Bibliothèque de l'École des Hautes Études.

সিলভ্যাঁ লেভির গ্রন্থ


LA

RELIGION VÉDIQUE

D'APRÈS LES HYMNES DU RIG-VEDA

PAR

ABEL BERGAIGNE

MAÎTRE DE CONFÉRENCES A LA FACULTÉ DES LETTRES DE PARIS
ET A L'ÉCOLE [illegible] ÉTUDES

PARIS
F. VIEWEG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
67, RUE DE RICHELIEU, 67

[illegible]

আবেল বেয়ার গাঞ-এর গ্রন্থ

পক্ষপাতদোষহীন মন নিয়ে লেভি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থটি লিখেছিলেন—*Le Théâtre Indien* (১৮৯০)। জার্মান গবেষকরা নাটক বলতে একমাত্র আদর্শ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন গ্রিক নাটককে। আর তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এ দেশীয় প্রাচীন নাটকাদির মূলেও সেই গ্রিক প্রভাবই বিদ্যমান। কিন্তু সিলভ্যাঁ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রমাণ করলেন যে সংস্কৃত নাটকগুলো শিকড়গতভাবেই মৌলিক। যিনি প্রকৃত বোদ্ধা, তিনি নিজস্ব মতটুকু উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হন না, বরং একের পর এক উদাহরণ প্রমাণস্বরূপ এনে সেটিকে প্রতিষ্ঠাও করেন। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে লেভি মিলিয়েছিলেন নৃতত্ত্বকেও। ভারতীয় ভাষার ইতিহাসের সমান্তরালে নিয়ে

এলেন ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে অন্যান্য ভাষার ইতিকথা। সুকুমার সেন কিন্তু সিলভ্যাঁ লেভির এই অসম্ভব পরিশ্রমের কাছে মাথা নত করেছিলেন—

> গোড়া থেকেই লেভী বুঝেছিলেন যে ভারতের ইতিহাস শুধু খণ্ডিতভাবে আলোচনা করলে চলবেনা। এশিয়ার অপর সংলগ্ন দেশগুলির ইতিহাসের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনেকখানি জড়িয়ে আছে। সুতরাং ভারতীয় বিদ্যার ও ভারতীয় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় শক, হুণ, ভোট, চীন, বর্মা, কম্বোজ, শ্যাম, বলি, জাভা—এইসব দেশের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস ভালো করে জানতে হবে। ...
>
> যে পদ্ধতি লেভী বাতলালেন তা নিজেই অনুসরণ করলেন অচিরে। চীনা ও তিব্বতীর চর্চা শুরু করলেন। তার ফলে লেখা হল কতকগুলি উৎকৃষ্ট গবেষণা প্রবন্ধ যাতে করে শক-কুষাণ-তিব্বতী-চীনাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হল।[২]

অধ্যাপক সুকুমার সেন নিজেও ছিলেন বহুভাষাবিদ। আসলে ভারতীয় ভাষাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই গভীর যে সেগুলোকে নিরূপণ করতে গেলে একবারে উৎপত্তি আর বিবর্তন গোড়া থেকে ঢেলে সাজাতে হয়। ভারতীয় ভাষাগুলোর শব্দভাণ্ডার বিদেশি শব্দের স্রোতে বেশ সমৃদ্ধ। তাই ভারতীয় ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণায় বেশ কিছু বিদেশি ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক দিকটিকে আত্মস্থ করতে হয়। সুকুমার সেন ভাষা-সাধনায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। পরম আদরে গ্রহণ করেছেন অন্যান্য ভাষার বৈচিত্র ও প্রাচুর্যকে। ড. তপন রায়চৌধুরী তাঁর *আচার্য সুকুমার সেন ও বঙ্গসংস্কৃতি*-তে বলেছেন—

> সুনীতিবাবুর যোগ্য শিষ্য সুকুমারবাবুর বঙ্গচর্চা ভারতবিদ্যার শক্ত মাটিতে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উনি মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন। আগেই লিখেছি ওঁর অনেক বইয়েরই উৎসর্গে আছে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক। এ ছাড়া প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত, পালি, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ, গাথার ভাষা, প্রাচীন পারসিক, শক, খোটানি, পহলবি এবং ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে গ্রিক, লাতিন, গথিক, প্রাচীন ইংরেজি,

> ফরাসি ও জার্মন তিনি শিখেছিলেন। সর্বসাকুল্যে মাতৃভাষা ছাড়া আরও সাতাশটি ভাষায় তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন।[৩]

তাই সারস্বতচর্চার সাদৃশ্যেই লেভির প্রতিভার বহুকৌণিকতাকে আবিষ্কার করেছিলেন সুকুমার। বুর্নুফের ধারণাকেই কিছুটা অনুসরণ করে প্রাচ্যদেশীয় ভাষা-সংস্কৃতি গবেষণায় দু'টি সক্রিয় গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জার্মান-গবেষক-গোষ্ঠী আর ফরাসি-গবেষক-গোষ্ঠী। ড. সেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন দুই পৃথক গোষ্ঠীর স্বীয় স্বীয় কর্মপদ্ধতি। জার্মান গবেষক-গোষ্ঠী সত্যের অতলে ডুব দিয়ে ঋজু ঋতলব্ধ সিদ্ধান্তকে তুলে আনে, আর ফরাসি গবেষক-বোদ্ধারা খোঁজেন স্থান-কালভেদে বিদ্যার যোগসূত্র। সুতরাং এখানেও সেই শাশ্বত দ্বি-শক্তির খেলা ক্রিয়াশীল। একদিকে 'centripetal force', অন্যদিকে 'centrifugal force'। মাঝখানে শুধুই অনন্ত! উত্তীর্ণ হবে না কেউই। এই দ্বিশক্তির দ্বিরালাপ চলবে চিরকাল।

ড. সুকুমার সেন তুলে ধরেছেন লেভির তিনবার ভারতবর্ষ আসার প্রসঙ্গ—

- প্রথমবার নেপালের পুথি ও ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে কর্মসূত্রে— ১৮৯৭-৯৮।
- দ্বিতীয়বার বিশ্বভারতীর আহ্বানে অধ্যাপনা সূত্রে— ১৯২০-২২।
- তৃতীয়বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাসূত্রে ও ভ্রমণ-উৎসাহে— ১৯২৯।

১৯১৪-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এদেশে আসার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার মূলে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত।

তবে, বিশ্বভারতীর সঙ্গে লেভির সংযোগ যে খুবই নিবিড় ছিল, তা বলাইবাহুল্য। ১৯২০-তে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেভির সাক্ষাৎ ঘটে। দূরদর্শী-সর্বজ্ঞ কবি সাদরে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্যে অনুরোধ জানান লেভিকে। এরপর ১৯২১-এর নভেম্বর থেকে ১৯২২-এর আগস্ট অবধি লেভি বিশ্বভারতীকে তার জ্ঞানের রসদটুকু উদারভাবে প্রদান করেন। লেভির বিশ্বভারতীতে আসা ও অধ্যাপনার একটি স্মৃতি তুলে ধরা যাক—

Rathindranath greeted Prof. Sylvain Lavi and his wife Desiree and fetched them to Maharshi Bhavan at Calcutta. When Prof. Levi and his wife reached Ashram in Santiniketan on 9th Nov, they were greeted at the Mango-garden.They took their seats and a sanskrit sloka written by Bidhushekhar Shastri, was sung . The Persian Prof Hidjibhai Morris delivered a small lecture in French, Rabindranath garlanded them with flowers and Candan and said; " Dear Acharya, On behalf of our Shantiniketan Ahsram , I offer you a hearty welcome. You know the wisdom which flowed in ancient India had its source in the depth of the "Tapovana"....

It was informed in the press that Prof. Levi will start taking classes from coming sunday, 20th Nov. Arrangements were made so that he could take his M.A. class in Calcutta University on every Sunday which would help the other students also.

Rabindranath requested Madam Levi to take French classes and she started taking classes from next day. Morris, Dinendranath, d other teachers were her first batch of students. Prof. Levi staryed to learn Bengali from Rabindranath and was taking classes of Chinese and Tibbetee. Bidhushekhar Shastri, Dharmadhar Rajguru Mahasthabir, Pravat Kumar Mukhopadhyay and other teachers were his students.[8]

লেভি পূর্ণ উদ্যমে ফরাসি, চিনা ও তিব্বতি ভাষার অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ধন্য হয়েছিল সেই ছাত্ররা যাঁরা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণের সুবর্ণসুযোগ

পেয়েছিলেন। 'দিনের পরে দিন যে গেল'—এই আত্মজীবনীমূলক রচনায় সুকুমার সেন লিখেছেন—

> শান্তিনিকেতনে সপ্তাহান্তিক যাতায়াত শুরু হল। প্রথম প্রথম আমাদের সঙ্গে কালিদাস নাগও যেতেন। ইউনিভার্সিটিতে তিন কালিদাসবাবু যোগ দিয়েছেন। ভারি সহৃদয় ও আমুদে লোক ছিলেন। প্যারিসে সিলভ্যাঁ লেভির কাছে পড়েছিলেন। লেভি তাঁকে ভালোবাসতেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দেবার সময়ে লেভি কালিদাসবাবুর নাম করতেন।[৫]

প্রকৃত শিক্ষক সর্বদাই জানেন যে, ছাত্ররাই তাঁর ভবিষ্যৎ। লেভিও হৃদয়-মনে ছাত্রদের জন্যে একটা বিশিষ্ট আসন ছিল। বিশেষত ভারতীয় গবেষক-ছাত্রদের প্রতি বিশেষ স্নেহ পোষণ করতেন লেভি। সুকুমার সেন তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

> লেভীর ভারতপ্রেমের বিশেষ প্রকাশ হয়েছিল প্যারিস ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি ব্যবহারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন বিষয়ের ছাত্র হোক্ না কোন ভারতবাসী হলেই তাঁর কাছে অবারিত দ্বার।[৬]

সুকুমার সেন তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে একটি সম্যক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—

> ধর্মশাখায় প্রথম হয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। এঁর দেশ ছিল যশোর কিংবা খুলনা। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন। শান্ত, ধীর, মৃদুভাষী, লাজুক— একহারা মানুষ, দীর্ঘকায় নয়, খর্বকায়ও নয়। আমরা যখন এম. এ. পড়ি তার শেষের দিকে বিখ্যাত ভারত-তত্ত্বজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvan Levi) এদেশে গতায়াত করছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিকবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনেও লেভি কিছুকাল ছিলেন। আশুবাবু প্রবোধবাবুকে সেখানে পাঠিয়ে দেন, তাঁর কাছে ভারততত্ত্ব ও চীনাভাষা শিখতে। প্রবোধবাবুর উৎসুক আগ্রহ দেখে লেভি তাঁকে নিজের ছাত্র করে নেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে চীন দেশ ঘুরিয়ে আনেন। তারপর লেভি আশুবাবুকে বলেন,

> প্রবোধবাবুকে কিছুকাল প্যারিসে পড়বার সুযোগ করে দেবার জন্যে। বিদ্যোৎসাহী আশুবাবু অকুণ্ঠভাবে প্রবোধবাবুকে ছুটি দিলেন। আর্থিক ব্যবস্থাও করেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। প্যারিসে থাকবার সময়ে সেখানে প্রবোধবাবু বেশ সাহায্য পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। সিলভ্যাঁ লেভির কাছে প্রবোধবাবু প্রায় বছর চারেক ছিলেন— শান্তিনিকেতনে, চীনে ও প্যারিসে। তারপর সেখানকার সবচেয়ে বড়ো উপাধি (অর্থাৎ State degree) Docteur és letters নিয়ে ফিরে আসেন নিজের পুরানো পদে।[৭]

আসলে নিজের ভারততত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণায় এক চূড়ান্ত সন্তুষ্টি পেতেন লেভি। আর শান্তিনিকেতন শুধু যে লেভির অধ্যাপকসত্তাকেই স্বাগত জানিয়েছিল, এমনটা নয়; সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছিল লেভির ইতিবাচক উপস্থিতিকে। রবীন্দ্রনাথের প্রাণকেন্দ্র শান্তিনিকেতন থেকে তিনি পেয়েছিলেন মানবিক প্রীতির এক অনাবিল আস্বাদ। তাই রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতন-বর্গের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনিও। ১৯২৩-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে ধরা পড়ে লেভির আনন্দ-বিহ্বল স্মৃতির উচ্ছ্বাস—

> I do not know if Santiniketan will ever rank among the most developed institutions of learning in the world, but you can be satisfied that you have built up an abode of unparallel peace. I long [for] the day when I can sit again in the shade of the mango-trees, walk along the noble alley of shals, talk, dream, listen to music, to verses, enjoy your delightful, sweet, dear company together with the beloved friends there.[৮]

যে কোনো গবেষণাকর্মের দুই প্রকার আবেদন থাকে। সমকালীন ও চিরন্তন। সুকুমার সেনের কাছে লেভির কর্ম-পরিধি ও রচনা-বিশ্ব এই দুই প্রকার আবেদনকেই ফুটিয়ে তুলেছিল। লেভির প্রতি তাঁর অগাধ মুগ্ধতা, বিস্ময় আর শ্রদ্ধা উজ্জ্বলভাবে জেগে ছিল আজীবন। নিজেকে আদর্শ অধ্যাপক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে যে যে ব্যক্তিত্বগুলিকে সম্মুখে

রেখেছিলেন সুকুমার, তাঁর মধ্যে সম্ভবত প্রথম সারিতেই ছিলেন সিলভ্যাঁ লেভি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হওয়ার আগেও লেভি হচ্ছেন মানবতাবাদী শিল্পী। তাই লেভির স্মৃতিতে সুকুমারের হৃদয়ে বয়ে চলে শ্রদ্ধার এক নদী, যার দুই তীরে অজস্র প্রণামের ভিড়। পরিশেষে স্বীকার করতেই হয় যে, সিলভ্যাঁ লেভি আর সুকুমার সেন উভয়েই সমগ্র জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে – 'विद्यां ददाति विनयं' (বিদ্যা দদাতি বিনয়ং)।

সূত্র নির্দেশ—

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পণ্ডিত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ সম্পাদিত ও পণ্ডিত শ্যামাচরণ কাব্যরত্ন কর্তৃক পরিমার্জিত ও সংশোধিত, ১৯৮৫, মহেশ পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ- ১৯৭

২। সুকুমার সেন, প্রবন্ধ সংকলন ২— সংস্কৃত সাহিত্য সাধক: সিলভ্যাঁ লেভী, জানুয়ারি ২০১৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ৪৫৩-৪৫৪

৩। তপন রায়চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ডিসেম্বর ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ১২৫

৪।https://sesquicentinnial.blogspot.com/2012/06/rabindranath-and-sylvain-levi.html, SMARAKA GRANTHA, Sesquicentennial (150th) birth Anniversary of Rabindranath Tagore. Date of Access : 09.02.2024.

৫। সুকুমার সেন, দিনের পরে দিন যে গেল— অখণ্ড সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ১৩৪

৬। সুকুমার সেন, প্রবন্ধ সংকলন ২— সংস্কৃত সাহিত্য সাধক: সিলভ্যাঁ লেভী, পৃ ৪৫৫

৭। সুকুমার সেন, দিনের পরে দিন যে গেল— অখণ্ড সংস্করণ, পৃ ১৯০

৮। https://www.visvabharati.ac.in/SylvainLevi.html, বিশ্বভারতীর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, Date of Access: 09.02.2024.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা

ড. অন্তরা চৌধুরী

সংক্ষিপ্তসার : বহুভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষে কোনো একটি ভাষার স্বীকৃতি আক্ষরিক অর্থে অসম্ভব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সমস্যাটি বহু পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন। তিনি লোক প্রচলিত 'বাজারী হিন্দি' সর্বভারতীয় স্তরে রোমান হরফে লেখার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর মত অনুসারে ভারতবর্ষের সকলভাষার বিকাশের পথে শুধুমাত্র একটি ভাষার স্বীকৃতি ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপন্থী। সকল ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সকল ভাষার বিকাশ এবং ইংরেজি ভাষার সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবহারকে তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। যদিও তিনি মনে করেছিলেন সর্বভারতীয় স্তরে 'বাজারী হিন্দি'-র যে বোধগম্যের দিক রয়েছে সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে লিখিত রূপ সকল ভারতীয়র অনুধাবন করা অসম্ভব তাই তিনি হিন্দি অক্ষরের বদলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী ভারতীয়দের জন্য রোমান হরফ ব্যবহার করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার বহু পূর্বে তিনি যেভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছিলেন তার গুরুত্ব আজও হারিয়ে যায়নি।

সূচক শব্দ : ভারতবর্ষ, ভারতীয়, রাষ্ট্রভাষা, হিন্দি, রোমান হরফ, ইংরেজি

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে ভারতবর্ষের ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পাণিনি যে রূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন, আধুনিক ভারতের ভাষার ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর (১৯৯০-১৯৭৭) ভূমিকাকেও সেরূপ বলা যেতে পারে। তাঁর গবেষণায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অজানা ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি ভাষা প্রসঙ্গে যখনই আলোচনা করেছেন তখনই তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অঙ্কন করেছেন। বাংলা তথা ভারতীয় সকল ভাষার ইতিহাস তাঁর আলোচনায় উঠে আসে। এমনকি আরবি, ফারসি, ইংরেজি

প্রভৃতি বিদেশি ভাষা নিয়ে আলোচনাতেও সেই ভাষা সম্পর্কে নিষ্ঠাবান ছিলেন। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যসমূহ।

১৯৪০ সালে আমেদাবাদে গুজরাট ভার্ণাকুলার সোসাইটিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দিকে ‘National Language of India’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেন। এই বক্তৃতা ১৯৪২ সালে ‘Indo-Aryan and Hindi’ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্বাধীনতার পরে তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেন। তিনি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির জন্য ইংরেজিকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন কারণ তা না হলে ভারতবর্ষ বহু-ভাষা সমস্যার সম্মুখীন হবে। আমাদের আলোচনায় তার বক্তব্যগুলিকেই সূত্রবদ্ধ করা হবে।

সর্বভারতীয় স্তরে আলোচনাতে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার বহুপূর্ব থেকেই তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা নির্ণয়ের সমস্যাটি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে ইংরেজি শব্দ বর্তমানে ভারতীয় ভাষাগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। আর শুধু ভারতবর্ষের নয় সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যার জন্য ইংরেজি ভাষাই একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু ইংরেজি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। ইংরেজি ভাষা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ করতে পারলেও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইংরেজি না জানা মানুষদের সঙ্গে সংযোগ সাধনে ব্যর্থ।

স্যার জর্জ আব্রাহম গ্রিয়ারসন তাঁর ‘Linguistic Survey of India’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ভারতে ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা বর্তমান। সুনীতিকুমারের মতে, এই ১৭৯টি ভাষার মধ্যে ১১৬টি ভাষা কতকগুলি উপজাতির অন্তর্গত যাদের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম। এছাড়াও আরো ২৪টি ভাষা আছে যা অন্যভাষার অন্তর্গত বা ভারতের বাইরে কোনো কোনো ভাষায় খুব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত। তিনি মোট ১৫টি ভাষাকে ভারতের মুখ্যভাষা বলেছেন। যেমন – ১. হিন্দি বা সাধু হিন্দি বা নাগরী হিন্দি ২. উর্দু ৩. বাঙ্গালা ৪. উড়িয়া ৫. মারাঠি ৬. গুজরাটি ৭. সিন্ধি ৮. কাশ্মীরি ৯। পাঞ্জাবি ১০. নেপালি ১১. আসামি ১২. তেলেগু ১৩. কানাড়ী ১৪. তামিল ১৫. মালয়ালম। এদের মধ্যে হিন্দিই এমন একটি ভাষা যে ভাষার সাহায্যে উত্তর

ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলিতে জনসংযোগ সম্ভব। তাই হিন্দিই হল এমন ভাষা যাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথাও তিনি তুলে ধরেছিলেন। হিন্দির চারটি রূপ আছে, যথা— ১. সাধু হিন্দি ২. উর্দু (সাধু হিন্দি এবং উর্দুর ব্যাকরণ একই কিন্তু বর্ণমালা আলাদা) এবং দুটি কথ্য রূপ। তবে এই চারটি নয় সমগ্র ভারতে যে হিন্দি প্রচলিত হয়ে আছে সেটিকে তিনি 'বাজারী হিন্দি' বা 'চালু হিন্দি' বলেছেন। সুনীতিকুমারের মতে, "এই 'বাজারী' বা 'সোজা' বা 'সরল' হিন্দিই হইতেছে নিখিল ভারতের সত্যকারের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা – শুদ্ধ, সাধু হিন্দি অথবা কেতাবী উর্দু নহে।" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৫১; পৃ-৩৫) সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে স্বীকৃতি দেওয়া সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত হলেও হিন্দির বর্ণমালার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন— স্বরধ্বনির জন্য বর্ণগুলি রয়েছে তার দুটি বা দুয়ের অধিক রূপ আছে; ব্যঞ্জনের আগে বসলে একটি রূপ, পরে থাকলে আরেকটি রূপ, সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ভগ্ন রূপ দেখা যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান লিপি প্রয়োগ করতে বলেছেন, তাঁর মতে, "ভারতীয় বর্ণমালার বিজ্ঞানানুমোদিত ক্রমে সাজাইয়া লইয়া, সরল আকৃতির রোমান বর্ণগুলি যদি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে মনে হয় উপস্থিত অবস্থায় আমরা একটি সম্পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণমালা লইতে পারিব।" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৫১, পৃ. ৪৮)

স্বাধীনতার পর সাধু হিন্দিকে (বা হিন্দুস্থানী অর্থাৎ শুদ্ধ হিন্দি ব্যাকরণ) প্রধান রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি ও সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবহারে সায় দেওয়া হয়েছে। তাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সুনীতিকুমারের মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ— "বহুভাষী ভারতীয় রাষ্ট্রে গঠন ধ্বংস করার জন্য ভাষান্ধতা যে আগুন জ্বালিয়েছে ইংরেজি ভাষার বর্ষণে যদি তা না নিভিয়ে ফেলি তা হলে আর কোন অলৌকিক শক্তি আমাদের বাঁচাবে জানি না। হিন্দিকে পবিত্র গঙ্গোদক মনে করে এ কাজ ভারতের উপযুক্ত মনে করি না কেন, হিন্দি দ্বারা সে আগুন নিভবে না, আগুন ইতিমধ্যে জ্বলতে আরম্ভ করেছে।" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৫১, পৃ.১০৯) তিনি ইংরেজি ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন— "... এ ভাষা নিরপেক্ষ ভাষা, ভারতীয় অন্য কোন ভাষার সঙ্গে

এর বিবাদ নেই এবং তাদের অবাধ উন্নতির পথে কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি।" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৮,পৃ. ১০৯)

বহুভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষে কোন একটি ভাষার বিশেষ স্বীকৃতি আক্ষরিক অর্থে অসম্ভব। সুনীতিকুমার এই সমস্যাটি বহু পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন, তিনি লোকপ্রচলিত 'বাজারী হিন্দি'কে সর্বভারতীয় স্তরে রোমান হরফে লেখার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর মত অনুসারে ভারতবর্ষের সকল ভাষার বিকাশের পথে শুধুমাত্র একটি ভাষার বিশেষ স্বীকৃতি ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপন্থী। সকল ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সকল ভাষার বিকাশ এবং ইংরেজি ভাষার সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবহারকে তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। বহুভাষাভাষীর দেশ ভারত একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যদি ভাষা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ হয়, তাহলে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষে বহু ভাষার অস্তিত্ব স্বীকৃতির অভাবে আজ বিপন্ন। তাই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদর্শিত পথটি অনুসরণই বর্তমানে একমাত্র পথ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'ভারতের এক লিপি প্রচলন কার্যত কতদূর সম্ভব' (প্রথম প্রকাশ যুগান্তর শারদীয়, ১৩৬৮), ঘোষ, বারিদবরণ (সংকলক ও সম্পাদক), 'অগ্রন্থিত সুনীতিকুমার', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯।

(ক) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ', চৈত্র ১৩৭১ (প্রথম প্রকাশ : শিক্ষক পত্রিকা) গ্রন্থ- তদেব।

২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'বাংলা ভাষার কুলজী', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (প্রথম প্রকাশ-সবুজপত্র) ঘোষ, বারিদবরণ (সংকলক ও সম্পাদক), 'নির্বাচিত রচনা সংকলন', মিত্র ও ঘোষ, পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৫।

(ক) 'বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ' অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ (প্রথম প্রকাশ – রূপ ও রীতি) গ্রন্থ- তদেব।

(খ) 'বাংলা উচ্চারণ শিক্ষা', ১৩৬৬ (প্রথম প্রকাশ – শিক্ষক শারদীয়া সংখ্যা), গ্রন্থ- তদেব।

(গ) 'বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিককার কথা', ১৩৭৮ (পদক্ষেপ শারদ সংকলন) গ্রন্থ-তদেব।

৩. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৫১।

৪. 'ভাষা' সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর-এপ্রিল, ১৯৮২, নাথ, মৃণাল (সম্পাদক), প্রবন্ধ (সম্পাদক)। প্রবন্ধ – চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'ভারতীয় পরিভাষা'।

৫. 'ভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় প্রকাশ, মে-অক্টোবর, ১৯৮৩, সম্পাদক-নাথ, মৃণাল, প্রবন্ধ – চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা'।

চাঁই ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজির তুলনা বাচ্য

পরিমল মন্ডল

সংক্ষিপ্তসার : পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী চাঁইনামে এক উপজাতি রয়েছে। এই জাতি মূলত মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলায় বসবাস করে। এদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতির সঙ্গে আবার একটা নিজস্ব ভাষাও বিদ্যমান। চাঁইভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার-এর একটা বিস্তর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ও ইংরেজির মতো চাঁই ভাষাতেও বিশেষ ভঙ্গিমা করে কথা বলা যায়। বাক্যে কথা বলার যে বিশিষ্ট ভঙ্গি, তাকেই বাচ্য বলে। বাংলায় যেমন– কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য রয়েছে এই চার প্রকার বাচ্য রয়েছে, চাঁই ভাষাতেও তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর ইংরেজিতে ভয়েস তিন প্রকার – Active Voice (কর্তৃবাচ্য), Passive Voice (কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য), Quasi-passive Voice (কর্মকর্তৃবাচ্য)। কর্তৃবাচ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া - চাঁই ও বাংলায় থাকে এই ফর্মাটে। হ্যাম্মা ভাত খাহি (আমি ভাত খাই) হ্যাম্মা (I) – আমি, ভাত (rice)-ভাত, খা হি (eat) – খা ই। বাংলা ও চাঁই – Subject Object Verb কিন্তু ইংরেজি Subject Verb Object। কর্মবাচ্য দ্বারা দিয়ে কর্তৃক বিভক্তি কিন্তু চাঁইয়ে শুধু ‘দ্বারা’ বিভক্তি হয়, ইংরেজিতে by with হয়। হ্যাম্মার দ্বারা ভাত খাল হোহ্যাই – আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হয়। Rice is eaten by me। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার প্রধান্য। তোর কাঁহাম্যা র্যাহ্যানাই হোহ্যাও – আপনার কোথায় থাকা হয়/তোমার কোথায় থাকা হয়/তোর কোথায় থাকা হয়। তোর, আপনার, তোমার এই বাচ্যে উহ্য থাকলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়। ইংরেজিতে এই বাচ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ Voice নেই। কর্মকর্তৃবাচ্য চাইঁ, বাংলায় ও ইংরেজিতে আছে। ম্যাহু খ্যাইতে মিষ্টি – মধু খেতে মিষ্টি (Honey tastes sweet.)।

সূচক শব্দ : চাঁই, বাচ্য, Voice, কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য, কর্মকর্তৃবাচ্য, active voice, passive voice, impersonal voice, quasi-passive voice, subject, verb, object.

বাচ্য (Voice)

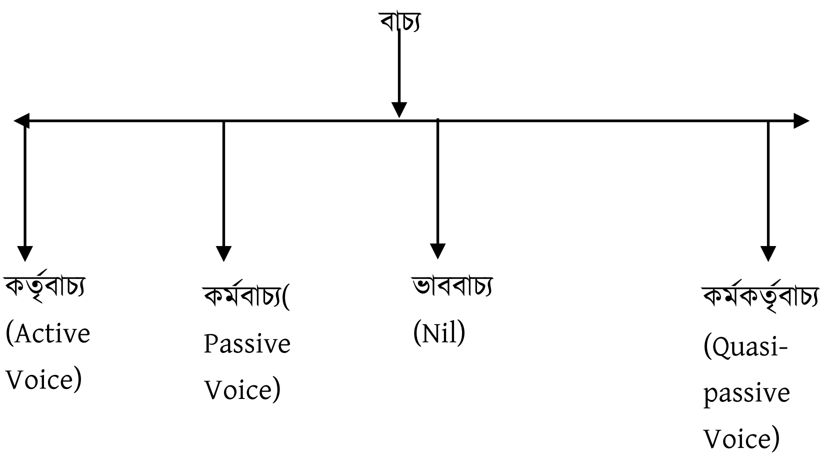
সংজ্ঞা (Definition) : বাক্যে কথা বলার বিশিষ্ট ভঙ্গীকে বাচ্য বলে (Voice)। বাক্যে ক্রিয়ার সম্বন্ধ কর্তার সঙ্গে না কর্মের সঙ্গে কিংবা কর্তাকর্ম কারোর সঙ্গেই না-হয়ে তা কেবল ক্রিয়ার ভাবটিকেই প্রকাশ করে, এরূপ ক্রিয়ার রূপভেদকেই বলা হয়।

চাঁই : বাক্যোম্যা কাথা বোল্যাকে একধ্যার্যাণকে ধাঁইচকে "বাচ্য" ক্যাহ্যায়। (Voice is a set of form of a verb showing the relation of the subject to the action.)

বাচ্যের সাহায্যে, একই বক্তব্যকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করা যায়— তার জন্য মানের বা **অর্থের** কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তবে বাক্যের **গঠনগত কাঠামোর** পরিবর্তন ঘটে। যেমন—

হ্যাম্ম্যা বাপুকে চিঠি লিখলিহ্যায়। (আমি বাবাকে চিঠি লিখেছি।) I have written a letter to my father.	হ্যাম্ম্যার দ্বারা বাপুকে চিঠি লিখনাই হোল্যাহ্যাই। (আমার দ্বারা বাবাকে চিঠি লেখা হয়েছে।) A letter has been written **to** my father by me. Or, **My father** has been written a letter by me.
মশাইকে কাহাঁম্যা রাহ্যানায় হোহ্যায়।(মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?) Nil	কাহাঁম্যা র্যাহ্যান মশাই/**হো**? (মহাশয় কোথায় থাকেন?) Where do you stay/live, sir?
হ্যাম্ম্যার বই প্যাহ্যাড়নাই হোল্যাহ্যাই। (আমার বই পড়া হয়েছে।) Book is read by me.	হ্যাম্ম্যা বই প্যাহ্যাড়লিহ্যাই।(আমি বই পড়েছি।) I read book.
ত্যাঁই ক্যাবে ঘুরিকে আব্যাহ্যান? (তুমি কবে ফিরছো?) When will you return?	তোর ক্যাবে ঘুরিকে আনাই হোহ্যাও? (তোমার কবে ফেরা হচ্ছে?) Nil

বাচ্যের শ্রেণিবিভাগ :
বাংলার মতো চাঁই ভাষায় বাচ্যকে চার ভাগে এবং ইংরেজিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—



১. কর্তৃবাচ্য (Active Voice)

সংজ্ঞা : যে বাইক্যোম্যাকে কর্তাট্যাই ক্রিয়াকে কাম ক্যার‍্যাহ্যায়, ক্রিয়াপ্যাদটা ডাইরেট কর্তাকে স্যাঁঙে জোড়িত র‍্যাহ্যায় আর ক্রিয়াপ্যাদটা কর্তাকে অনুগামী হোহ্যায়, ওকরাকেই কর্তৃবাচ্য ক্যাহ্যায়। (যে বাচ্যে কর্তাই ক্রিয়ার কার্য সম্পন্ন করে, ক্রিয়াপদটি সরাসরি কর্তার সঙ্গে অন্বিত থাকে এবং ক্রিয়াপদটি কর্তারই অনুগামী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে।) When the subject of a verb is the doer of some action, the verb is in the Active Voice.

উদাহরণ :
সোঞ্জা গাউন জানাহ্যায়। (সঞ্জয় গান জানে।) – Sanjoy knows song or Sanjoy knows to sing.
ভুবনা দিল্লি গেল্যাহ্যায়। (ভুবন দিল্লি গেছে।) – Bhuban has gone to Delhi.
জীবনা পাড়াশুনা ন্যায় ক্যার‍্যাহায়। (জীবন পড়াশুনা করে না।) – Jiban does not study.

সূর্যোকে চারোব্যাগ্যাল/ চারোকোড়ে পিরথিবি ঘুর্‌য়াহ্যায়। (সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরে।) – The earth moves round the sun.
হ্যারিণটা বাককে ভ্যায়ম্যা জ্যাঙ্গ্যালম্যা নুক্যাল্যাহ্যায়। (হরিণটি বাঘের ভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।) – The deer has hidden in the jungle in fear of tiger/ The deer has taken shelter in the jungle in fear of tiger.

কর্তৃবাচ্যের বৈশিষ্ট্য : (Characteristic features of Active Voice) -
১. কর্তৃবাচ্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে। য্যাইসান (যেমন) – সোঞ্জা (সঞ্জয়), ভুবনা (ভুবন), জীবনা (জীবন)।
২. কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি (verb) অকর্মক (Intransitive) এবং সকর্মক (Transitive) দু-রকমই হতে পারে। য্যাইসান (যেমন) – তোরা ক্যাখনি **আব্যাহ্যান**? (তোমরা কখন **আসছো**?) – When are you **coming**? (নীচে দাগ দেওয়াগুলি অকর্মক ক্রিয়া / Intransitive verb)।
রোমনা কি ভাত **খ্যালক্যাহ্যায়**? (রমেন কি ভাত **খেয়েছে**?) – Has Ramen **eaten** rice? (সকর্মক ক্রিয়া/Transitive verb)
কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি সকর্মক হলে, বাচ্যটিকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায় এবং যেখানে ক্রিয়াটি অকর্মক তাকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়।
৩. কর্তৃবাচ্যে সাধারণত “শূন্য” বিভক্তি হয়। (Preposition গুলো বিভক্তির মতো কাজ করে তবে Preposition হয় না Nil থাকে) – য্যাইসান – সোঞ্জা (সঞ্জয়), ভুবনা (ভুবন), জীবনা (জীবন)- চাঁই ভাষায় বিভক্তি “আ” বাংলায় সাধারণত “অ”, “য়”।
দ্বিকর্মক ক্রিয়ার (Double Object verb / Retained object) ক্ষেত্রে “মুখ্যকর্মে” (Dircet Object) “শূন্য” বিভক্তি এবং “গৌণ কর্মে” (Indirect Object) চাঁই-এ “কে” বিভক্তি, বাংলায় “কে”, “রে” বিভক্তি এবং ইংরেজিতে “to” preposition বসতে পারে। Example – হ্যাম্ম্যা **রামকে** একটা **চিটঠি** দেলি। (আমি **রামকে** একটা **চিঠি** দিলাম)- I have given **Ram** a letter/ I have a letter **to Ram**.

২. কর্মবাচ্য (Passive Voice)

সংজ্ঞা : যে বাচ্যম্যা কর্মপ্যাদটা কর্তৃপ্যাদম্যা বাদলাকে বাইক্যোম্যা গুরুত্ব পাব্যাহ্যায় আর ক্রিয়া ক্যার্মোকে অনুগামী হোহ্যায়, ওকরাকে কর্মবাচ্য ক্যাহ্যায়। (যে বাচ্যে কর্মপদটি কর্তৃপদে পরিণত হয়ে বাক্যে প্রাধান্য পায় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়, তাকে বলে কর্মবাচ্য। বা যে বাক্যে কর্মই মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে।) When the subject of a verb is the receiver or sufferer of some action, the verb is in the Passive Voice.

উহাহরণ :

হ্যাম্ম্যার দ্বারা অ্যাই কামটা হোল্যাহ্যাই – আমার কর্তৃক এ কাজটি হয়েছে। - The work has been done by me.

রোবিন্দ্রনাথকে দ্বারা গীতাঞ্জলি রচনা হোল্যাহ্যাই – রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতাঞ্জলি রচিত হয়। - The Gitanjali is written by Rabindranath.

তোর দ্বারাসে অ্যাই কাম ন্যায় হোত্যাও – তোর দ্বারা এই কাজ হবে না। - This work will not be done by you.

অ্যাইগ্লা স্যাপ কুচ্ছুয়ে ওক্যার জান্যাল – এসব কিছুই তার জানা। - Everything is known to him.

কর্মবাচ্যকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Characteristicc features of Passive Voice)

১. অকর্মক ক্রিয়ার (Intransitive verb) কর্ম (object) নেই, তাই অকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্য (Passive) হয় না।

য্যাইস্যান(যেমন)- বাপুকে দ্বারাসে ব্যাহিনকে ভূগোল পাঢ়ানায় হোহ্যায় – বাবার দ্বারা বোনকে ভূগোল পড়ানো হচ্ছে – Sister is taught Geography by father.

২. কর্মবাচ্যের (Passive Voice) কর্মপদটি (Object) সাধারণত “শূন্য” বিভক্তিযুক্ত হয়।

য্যাইস্যান – **ছাপটা** আঁকনাই হোহ্যায় – **ছবিটি** আঁকা হচ্ছে – **The picture** is being drawn.

৩. “হ” ধাতু(root verb) করে কর্মবাচ্যের (Passive Voice) ক্রিয়াপদটি (Verb) গঠিত হয়।

য্যাইসান(যেমন)- ডাক্তার বোলনাই **হো**উক – ডাক্তার ডাকা **হো**ক। - Let the doctor be called.
৪. কর্তৃবাচ্যের (Active Voice) কর্তা (Subject) কর্মবাচ্যে (Passive Voice) এসে চাঁই ও বাংলায় দুটোতেই “র”, “এর” প্রভৃতি সম্বন্ধপদের বিভক্তি যুক্ত অথবা চাঁইয়ে “দ্বারা” বা “দ্বারাসে” এবং বাংলায় “দ্বারা”, “দিয়ে”, “কর্তৃক” অনুসর্গ, ইংরেজিতে “by”, “with” Preposition যুক্ত হয়।

য্যাইসান (যেমন) – **য়ু** সিয়্যা ন্যায় পারতাউ(**সে** সেলাই পারবে না)-**He/She** can not stitch> ওক্যা**র** দ্বারাসে সিনাই ন্যায় হোতাউ (তা**র** দ্বারা সেলাই হবে না)-Stitch will not be done by **him**.
৫. কর্মবাচ্যের (Passive) ক্রিয়া (verb) কর্তারূপী কর্মের (Object) পুরুষ (Person) ও বচন (Number) অনুসারে হয়।
উহাহরণ – রাজুয়াকে দ্বারা কানাটাকে ভিক্ষা দেনাই হোহ্যায়(রাজু কর্তৃক অন্ধটিকে ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে) – The blind is given alms by Raju.
৬. ইংরেজিতে by, with ছাড়াও “to”, “in” বসে আর চাঁইয়ে শুধুমাত্র “দ্বারা” বা “দ্বারাসে” বসে।

৩. ভাপবাচ্য/ভাববাচ্য (Impersonal Voice)

সংজ্ঞা : যে বাইক্যম্যা ক্রিয়াটাই বাইক্যকে ভাপকে আসলি জিনিস বোলিকে ঠিক হোহ্যায়, তেকরাকেই ভাপবাচ্য ক্যাহ্যায়। (যে বাক্যে ক্রিয়াই বাক্যের মধ্যে প্রধান বক্তব্য বলে প্রতীত হয় ও বক্তার কাছে ক্রিয়ার ঘটনাই প্রধান, কর্তা (Subject) বা কর্ম (object) প্রধান নয়, তাকে ভাববাচ্য বলে।
ইংরেজিতে সুনির্দিষ্টভাবে “ভাববাচ্য” পাওয়া যায় না।
উদাহরণঃ-
দেবুয়াকেয়ে প্যারথাম **গাহাব্যলা** হোত্যায় – দেবুকেই প্রথমে **গাইতে** হবে – Debu **has to sing** first.
ভিতরিম্যা আকে ব্যাইসনাই হোউক – ভিতরে এসে বসা হোক – Let’s sit down inside.
কাহাঁ জানাই হোতাও - কোথায় যাওয়া হবে – Where will/shall be gone?

আইচখিনা তোরাকে কলেজ যাব্যালা হোতাও – আজ তোমাকে কলেজ যেতে হবে। - You have to go to college, today.

ভাপবাচ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characteristics)

১. ভাপবাচ্যম্যা ক্রিয়াকে(Verb) মানেটাই(meaning) আসস্যাল(ভাববাচ্যে ক্রিয়ার অর্থই প্রধান।)

২. ভাপবাচ্যকে উদ্দেশ্য প্যাদটা(Subject) বিধেয় (Predicate) ক্রিয়াজাতো কৃদন্ত প্যাদ হো যাহাই।(ভাববাচ্যের উদ্দেশ্য পদটি বিধেয় ক্রিয়াজাত কৃদন্ত পদ হয়ে থাকে।)

৩. ভাপবাচ্যম্যা কর্তাম্যা(Subject) সম্বন্ধ(possessive) বিভক্তি যোগ হোহ্যায়।(ভাববাচ্যে কর্তায় সম্বন্ধ বিভক্তি যোগ হয়।)

৪. ভাপবাচ্যকে ক্রিয়া(verb) অকর্মক(Intransitive) হোহ্যায়। (ভাববাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হয়)।

৫. ভাপবাচ্যকে ক্রিয়া স্যাপস্যাম্যায় "হ" ধাতু বা "যা" ধাতু ওয়ালা।(ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদা 'হ' ধাতু বা ' যা' ধাতু নিষ্পন্ন।)

চ্যাল একবের্ বাগিচ্চাসে ঘুরিকে আল **যা**উক/চ্যাল একবের বাগিচ্চাসে বেড়াকে আনাই **হো**উক – চলো একবার বাগান থেকে ঘুরে আসা যাক।(Let's go to walk in the garden.)

৪. **কর্মকর্তৃবাচ্য** (Quasi-passive Voice)

সংজ্ঞা : যেগলা বাক্যম্যা কর্তাকে উল্লেখ ন্যায় র‍্যাহ্যায় বরোঞ্চ কর্মস্থানীয় প্যাদটিয়ে কর্তাকে ম্যাত্যান কাম ক্যার‍্যাহ্যায় সেগ্লাকে কর্মকর্তৃবাচ্য ক্যাহ্যায়।(যে বাক্যবিন্যাসে কর্তার উল্লেখ থাকে না, কর্মটিই কর্তৃপদ অধিকার করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে।) A Quasi-passive Voice is active in form but passive in sense.

উদাহরণ :

ম্যাহু খ্যাইতে মিষ্টি – **মধু** খেতে মিষ্টি। - **Honey** tastes sweet.

বইটা ছাপনাই হোহ্যায় – **বইখানা** ছাপানো হচ্ছে। - **The book** is printing.

শ্যাঙ্খো ব্যাজাহ্যাই – শাঁখ বাজছে। - The conch is blowing.

গোলাপ ফুলকে গ্যান্ধো মিঠ্‌ঠা – গোলাপ ফুলের গন্ধ মিষ্টি। - The rose smells sweet.
রচনাটা প্যাহ্যাঢ়তে আচ্ছা – রচনাটি পড়তে ভালো। - The composition reads well.
আলু সাস্তা দামম্যা বেচ্যাহ্যায় – আলু সস্তায় বিক্রি হয়। - Potato sells cheap.
প্যাথথ্যার রুক্ষা – পাথর রুক্ষ। - Stone feels rough.
উপরের বাক্যে মাহু (মধু)-honey, বইটা (বই) – the book, শ্যাঙ্খো (শাঁখ) – the conch, গোলাপ-rose, রচনা-the composition, আলু – potato, প্যাথথ্যার (পাথর) – stone, এরা সবটাই বাক্যে কর্ম (object), কিন্তু কর্তার (subject)-এর মতো কাজ করছে এবং তাদের পরে finite verb গুলো তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আদো তাদের কাজ করার কোনো ক্ষমতাই নেই।

কর্মকর্তৃবাচ্যের বৈশিষ্ট্য (features of Quasi-passive voice)
১. কর্মকর্তৃবাচ্যে প্রাণিবাচক(animate) কিছু হবে না। যেমন- ঘুড়ি উড়ছে (kite is flying.) – কর্মকর্তৃবাচ্য। কারণ ঘুড়ি নিজে উড়ে না। কেউ না কেউ তাকে উড়াচ্ছে। কিন্তু পাখি উড়ছে (bird is flying.) – কর্মকর্তৃবাচ্য নয়। পাখিকে কেউ উড়াচ্ছে না। সে নিজেই উড়ছে।
২. কর্মকর্তৃবাচ্যের (quasi-passive voice) -এর বাচ্য পরিবর্তন করা যায় না। অন্য ভাবে বদলাতে হয়- যেমন- ম্যাহু খ্যাইতে মিষ্টি (মধু খেতে মিষ্টি)- Honey tastes sweet. – ম্যাহু খ্যাইতে মিষ্টি ল্যাগ্যাহ্যায় য্যাখনি স্বাদ লেল যাহাই(যখন স্বাদ গ্রহন করা অয় তখন মধু মিষ্টি।) – Honey is sweet when it is tasted.
৩. কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ কেবল কর্তৃবাচ্যের – সর্বদাই প্রথম পুরুষের (3rd Person)। যেমন- মধু খেতে মিষ্টি লাগে – Honey tastes sweet. “taste + s = tastes – 3rd person singular Number.

বাচ্য পরিবর্তন (Voice Change)

একটা বাচ্যসে ওইন্য বাচ্যম্যা বাদলানাইকে বাচ্য পরিবর্তন বা বাচ্যান্তর ক্যাহ্যায়। (একটি বাচ্য থেকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করাকেই বাচ্য-পরিবর্তন বা বাচ্যান্তর বলে।)

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য : (Active Voice to Passive Voice) চাঁই, বাংলা ও ইংরেজি

কর্তৃবাচ্য(Active Voice)	কর্মবাচ্য (Passive Voice)
রাম ভাত খ্যালক্যাহ্যায় (রাম ভাত খেয়েছে।) Ram has eaten rice.	রামকে দ্বারা ভাত খানাই হোলাহ্যায় (রামের ভাত খাওয়া হয়েছে।) Rice has been eaten by Ram.
হ্যাম্মা বই প্যাহ্যাঢ়িহি (আমি বই পড়ি) – I read book.	হ্যাম্ম্যার বই প্যাহ্যাড়্যাল হোহ্যাই (আমার বই পড়া হয়) – Book is read by me.
হামরা একটা গরু কিনলিহ্যাই (আমরা একটা গরু কিনেছি)- We have bought a cow.	হ্যাম্ম্যারক্যান দ্বারা একটা গরু কিন্যাল হোল্যাহ্যাই(আমদের কর্তৃক একটি গরু ক্রয় করা হয়েছে) – A Cow has been bought by us.
রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ছোড়ি দেলক্যাহ্যাই (রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন) – Rabindranath gave up the Knighthood.	রবীন্দ্রনাথকে দ্বারাসে নাইট উপাধি ছোড়ি দেনাই হোলাহ্যায় (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যাত হয়।) – The knighthood was given up by Rabindranath.
ত্যাঁই একটা চাখরি প্যাইল্যাহ্যান (তুমি একটা চাকরি পেয়েছ) – You have got a job.	তোর দ্বারা একটা চাখরি পানাই হোলাহ্যাও (তোমার একটা চাকরি পাওয়া হয়েছে।) – A job has been got by you.

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য(Passive to Active) চাঁই, বাংলা ও ইংরেজি

কর্মবাচ্য(Passive Voice)	কর্তৃবাচ্য(Active Voice)
অ্যাইগ্লা স্যাপটি ওক্যার জানাল্ (এ সমস্তই তার জানা) – Everything is known to him/her.	অ্যাইগ্লা স্যাপকুচ্ছু য়ু জানাহ্যায় (এ সমস্তই সে জানে) – He/she knows everything.
স্যাপ কেহুকে দ্বারাসেয়ে য়ু অপমান হোল্যাহ্যায় (সকলের দ্বারা সে অসম্মানিত হয়েছে) – He has	স্যাপ কেহু ওকরাকে অপমান ক্যারক্যাহ্যায় (সকলে তাকে অসম্মান করেছে।) Everybody /

been dishonoured by all / everybody.	all have / has dishonoured him.

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে চাঁই, বাংলা ও ইংরেজি

ভাববাচ্য(Impersonal Voice)	কর্তৃবাচ্য(Active Voice)
কেত্তাদিন প্যারে আনাই হোল্যাও? (কতদিন পরে আসা হল?)	কেত্তাদিন প্যারে/বাদে অ্যাইলে (কতদিন পরে এলে?) After how long time do you turn up?
বাংলাকে মুখ হ্যাম্মার দেখনাই হোল্যাহ্যাই (বাংলার মুখ আমার দেখা হয়েছে।) The face of Bengali has been seen by me.	বাংলাকে মুখ হ্যাম্মা দেখলিহ্যাই (বাংলার মুখ আমি দেখেছি।) The face of Bengali I have seen.

তথ্যসূত্র :

১. রচনা ভারতী, মনোজিৎ বসু ও ডঃ প্রদীপ সিংহ চৌধুরী, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০০৪
২. প্রান্তিক মাধ্যমিক ভাষা ভাবনা বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (প্রথম ভাষা), ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুদেষ্ণা মৈত্র, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০২২
৩. উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, বামনদেব চক্রবর্তী, পরিবর্ধিত অষ্টাদশ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩
৪. Concise Oxford Dictionary, O. U. P.
৫. A Unique English Grammar, Composition & Translation – following – J. C. Nesfield & Others, Compiled by Dr. R. P. Paul, S. M. Tribedi, Fourth Edition, April 2002
৬. চাঁই কবি প্রকাশ মন্ডল, মোবাইল নং – ৮৬৩৭০৮৭০৩৫/৯৮৫১০৩৫০৯৪
৭. চাঁই আদি কবি চন্দন মন্ডল, মোবাইল নং – ৭৬০২৭৫৪৪৮৮
৮. চাঁই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ডঃ সুনীল চন্দ্র মন্ডল, ১৯৮২
৯. An Open Discussion with Dr. Biju Chain, a retired Prof. of North Bengal University, Darjeeling
১০. চাঁই ভাষার রূপরেখা, ডঃ অনিমা পাল

বাণী বসু-র ‘খনামিহিরের ঢিপি’ : ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার

ড. শ্রীতা মুখার্জী

সংক্ষিপ্তসার : ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস’ গ্রন্থে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে সভ্যতা হল মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রূপশিল্প, সাহিত্যচর্চা, ধর্মজীবন প্রভৃতির যোগফল। এই সভ্যতা-সংস্কৃতির নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে চলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথামতো সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এভাবে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করে বলা যায় যে ঔপন্যাসিক বাণী বসুর ‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসে মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক সর্বাঙ্গীণ চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে।

‘খনামিহিরের ঢিপি’ মাতঙ্গীর গল্প, রঙ্কার গল্প। অন্যদিকে ‘সর্বমঙ্গলা-বেদবতী-রঞ্জাবতী-ঈশা’— এক পরিবারের অন্তর্গত চার প্রজন্মের নারীকে পাশাপাশি রেখে শব্দ দিয়ে নারীজীবনের নকশিকাঁথা বুনে গেছেন বাণী বসু। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতায়নের নীতি ও নারীর পরাজয়-পরাভব-পরাধীনতার কথা নতুন ভঙ্গীতে শুনিয়েছেন তিনি। আধুনিক সমাজমানসিকতার অন্তরালে বয়ে চলা প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির চোরাস্রোতকেও চিনিয়ে দিয়েছেন বাণী বসু। উপন্যাসে আদিম যুগের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সমসময়ের, অর্থাৎ একবিংশ শতকের সমাজ-সংস্কৃতিকে পাশাপাশি রেখে ঔপন্যাসিক বাণী বসু দেখাতে চেয়েছেন পূর্ববর্তী সময়কাল কীভাবে পরবর্তী সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। উপন্যাসের পর্ব থেকে পর্বান্তরে এই তুলনামূলকতা স্পষ্টতর হয়েছে। এবং ক্রমশই তা পাঠককে বুঝিয়ে দেয়, সমাজ বা রাষ্ট্রগঠনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের গোষ্ঠীগত রীতিনীতি বা মানুষের

স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিগত প্রবণতা কীভাবে কয়েক হাজার বছর পরেও মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। কখনো বা অত্যাধুনিক সমাজব্যবস্থার রন্ধন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদির মতো পরিচিত চিত্রাঙ্কন করে উপন্যাস কথক পাঠককে তার আদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। শোনান তার গোড়ার কথা। দেখাতে চেয়েছেন সময়ের অনেকখানি ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মানবচক্ষুর অন্তরালে যুগধর্ম কীভাবে এখনও রক্ষিত হয়ে চলেছে।

সূচক শব্দ : প্রযুক্তি, আত্মজবানি, লোকজ উপাদান, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য

একবিংশ শতকে অধিকাংশ মানুষের জীবন ও জগৎ সুরক্ষিত, নারী-পুরুষের সম্পর্ক সুবিন্যস্ত। শখ-শৌখিনতা, বিলাসব্যসন উচ্চ জীবিকারত মানুষের জীবনকে করে তোলে উপভোগ্য। প্রযুক্তি এনে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা। এই টেকনোলজি নির্ভর, যান্ত্রিক সভ্যতায় অভ্যস্ত মানুষের জীবনের কিছু মূলসূত্র আজও প্রোথিত হয়ে রয়ে গেছে অতীতের বুকে। অরণ্যজীবনের আদিম-অসভ্য মানুষের প্রতি বর্তমান সভ্যতার দায়বদ্ধতা যেন অস্বীকার করার নয়। অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতিকে পাশাপাশি রেখে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের জ্ঞানে ঋদ্ধ ঔপন্যাসিক বাণী বসু ‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন।

ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস’ গ্রন্থে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে সভ্যতা হল উন্নত মানবসমাজের বাহ্যিক দিক। অর্থাৎ সভ্যতা মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রূপশিল্প, সাহিত্যচর্চা, ধর্মজীবন প্রভৃতির যোগফল। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “...এবং culture বা সংস্কৃতি বলিলে বুঝি – তাহার উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি— তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ; তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ; - তাহার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণবস্তু যাহা, মুখ্যতঃ তাহাই বুঝি।”[১] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথামতো সংস্কৃতিকে এভাবে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করে বলা যায় যে ‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের এক সর্বাঙ্গীণ চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। একথা স্পষ্ট যে সংস্কৃতি জীবনবিবিক্ত কোনো ক্রিয়া নয়। তবে এ প্রশ্ন আসতেই পারে মনে,

কেমন সে জীবন, কোন সে সংস্কৃতি, উপন্যাসের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে যার কথা!

জ্যোতির্ময়ী দেবী এক উপন্যাসের ভূমিকা অংশে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন – "নারী কবি মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। তাই স্ত্রী-পর্বের কোনো ইতিহাসই কোথাও নেই।"[২] প্রায় একশো বছর আগে লেখা 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই আত্মজবানির পরে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। দিনকাল বদলে গেছে অনেক। সেই সঙ্গে লেখা হয়ে গেছে নারীর জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ। সেলিনা হোসেন 'ঘরগেরস্থির রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আজকের বাংলাদেশে নারীর অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনে নারীর ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি।"[৩] তবে এই ইতিহাস লিখিত ইতিহাস না। সেখানে কেবল পাওয়া যাবে আদি পুরুষের কথা। পূর্বনারীর কোনো উল্লেখ সে ইতিহাসে নেই। থাকে না। তাই 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কবিতায় মল্লিকা সেনগুপ্তের সোচ্চার ঘোষণা, "জাভাপুরুষের গর্ভে পুরুষের জন্ম হয়েছিল/ নিয়েনডার্থাল ম্যান শিশুদের স্তন্যদায়িনী/ জাভা বা নিয়েনডার্থে মানুষেরা শুধুই পুরুষ/ পুরুষ একাই ছিল ভাগ্যবান আর ভগবতী/ পুরুষ জননী ছিল পুরুষ জনক/ পুরুষ স্বয়ং সুর এবং বাঁশরি/ পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু/ আমরা হিস্ট্রি থেকে এ রকমই জানতে পেরেছি/ আসলে হিজড়ে ছিল ইতিহাসবিদ্।"[৩] এই কবিতা আমাদের বলে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে না নারীজীবনের। তাই বিকল্প উপায় হিসাবে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে লোকসংস্কৃতির দিকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথিত মূল সংস্কৃতির স্রোতে অবগাহনের পরিবর্তে সেই লোকসংস্কৃতি থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে রসদ। সেখানেই নারীর অবমাননার ইতিহাস চাপা পড়ে আছে। রামায়ণ রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী থেকে শুরু করে নববর্ষের 'আমানি' উৎসবে, 'নবান্ন'-এ মেতে ওঠা নারী, 'আমার জীবন'-এর রাসসুন্দরী দেবী সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলস্রোতে স্বীকৃতি পাননি কোনোদিন কোথাও। এবার সময় এসেছে এই সংস্কৃতির মধ্যে থেকে নারীর প্রচ্ছন্ন জীবনকে তুলে আনার। কৃষিনারী, ঘরগেরস্থির চার দেওয়ালে চক্রাকারে পাক খেয়ে ঘুরতে

থাকা নারীর জীবনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে থেকে জীবনের সত্যকে আবিষ্কারের লক্ষ্যে লেখা হয়ে যায় বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিপি'।

বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিপি' হল এমনই এক গ্রন্থ, যা মাত্র ২৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে কথার সুনিপুণ বাঁধুনি দিয়ে নারীজীবনের বদলের ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক বিবরণ দিয়ে গেছে। এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের অভিজ্ঞতা হল তার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নরনারীর জীবনযাপনের বহুবিধ উপাদানের সংমিশ্রণে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সংস্কৃতিকে করে তুলবে পরিশীলিত, রুচিশীল। জীবনাচরণের শঠতা, এক লিঙ্গের অপরের ওপর দমনপীড়ন একটি জাতির সংস্কৃতির অবমূল্যায়নের কারণ হতে পারে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষ নারীকে 'অন্য' বা 'অপর' ভেবেছে। নারীর জীবনকে ঘিরে মিথ বা কিংবদন্তির কুয়াশা রচনা করেছে পুরুষ। অলীক কল্পনা ও অতিকথনের বোঝা চাপিয়ে নারীকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছে। শুধু নিম্নবর্গের নারীই নয়, সমাজের সবক্ষেত্রের নারী এই মিথের অন্তরালে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এখন সময় এসেছে সত্যের অন্বেষণের। লোকজীবনের অজস্র উদাহরণ থেকে মানুষ তাই খুঁজে নিতে চাইছে নারীজীবনের প্রকৃত সত্যকে। বাণী বসুর 'খনামিহিরের ঢিপি'-র কাহিনী তেমনই এক লোকজ উপাদান বা কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর কবিতার ভাষায় নারীদের পক্ষ নিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে ক্রোধ-ক্ষোভ প্রকাশ করেন। 'কথামানবী' মূর্তি বানিয়ে নিয়ে আগুনের এই কথাকার নির্যাতিতা নারীসমাজের পাশে দাঁড়ান। মল্লিকা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনে পৌরাণিক চরিত্র দ্রৌপদী, ঐতিহাসিক চরিত্র রাজিয়ার পাশে উঠে এসেছে ভারতীয় মিথের এক চরিত্র খনার কথা। 'খনা'— সে এক প্রতিবাদী নারী, সমাজ যার কণ্ঠকে রুদ্ধ করেছিল। কণ্ঠ তো প্রতীকী। আসলে 'আটক' দেওয়া হয়েছে নারীর সকল গতিবিধিতে। 'খনাজন্ম' কবিতায় যন্ত্রণায় অধীর খনার কণ্ঠে ব্যক্ত হয় এই উচ্চারণ –"জিভ সামলাতে পারিনি/ জিভ আগলাতে পারিনি/ খোলা মাঠে একা অসহায়/দাঁড়িয়েছে মোর জিহ্বা/তলোয়ার খোলা জল্লাদ/ছুটে এল ওকে মারতে/চিৎকার করে বললাম/মারবে তো মারো আমাকে/আমি মরে যাব লহমায়/বেঁচে থাক শুধু জিহ্বা।"[৫]

ভারতবর্ষ গ্রামীণ সভ্যতায় পুষ্ট, কৃষিকেন্দ্রিক দেশ এক। সেই ভারতেই জন্ম নিল, নাকি স্থানান্তরিত হল খনা। গল্পটি অতিপ্রাচীন। গল্প নয়

কিংবদন্তি। লোকের মুখে মুখে বেঁচে থাকে যে গল্প, তাই তো কিংবদন্তি। শুধু খনা-নাম্নী নারীর প্রসঙ্গ হলে গল্প বলেই একে সরিয়ে রাখা হত। কিন্তু এখানে এসে পড়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক সদস্য জ্যোতির্বিদ বরাহ ও তার সন্তান মিহিরের কথা। ঐতিহাসিক সত্য জড়িয়ে আছে বলেই কি নারী খনার কাহিনি বিশ্বাসযোগ্যতা পেল, কালের গর্ভে মুখ ঢাকল না চিরকালের মতো, সে প্রশ্ন এখানে গৌণ থেকে যাক। 'খনা' সম্পর্কে একই ধরনের মিথ প্রচলিত আছে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায়। ওড়িয়া ভাষায় 'খনা' অর্থ বোবা। বরাহ পুত্র মিহিরের স্ত্রী ছিল খনা। প্রজ্ঞাবতী, মেধাবিনী এই নারী কৃষিকার্যের আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে নিজ জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ছড়া রচনা করে যায়। দেশের কৃষি-অর্থনীতি তার অভিজ্ঞতাকে, পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠেছে ফলবতী। শুধু কৃষি বিষয়ক ছড়া না, রাষ্ট্রশাসন, দেশের পরিবর্তমান পরিস্থিতির আভাস দেওয়া হয়েছে খনার বচনে। বুদ্ধিমতী এই নারী জ্যোতিষ গণনা করতে জানত। বরাহ-মিহিরের থেকে নিজ কৃতকর্মে এগিয়ে ছিল খনা। নিজ প্রজ্ঞার বলে দেশজ সংস্কৃতিকে যেন গড়ে নিয়েছিল খনা। তবু নেহাত নারী বলেই তার সব গুণ পর্যবসিত হল ব্যর্থতায়। সমাজ কোন অস্ত্রে প্রতিহত করেছিল খনার অগ্রগতিকে তা জানিয়েছেন সেলিনা হোসেন, 'ঘরগেরস্তির রাজনীতি' গ্রন্থে— "...কিন্তু পুরুষতন্ত্র খনাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে প্রথমে খনার জিহ্বা কেটে দিয়ে, দ্বিতীয় ধাপে ইতিহাসে খনাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। ব্যাপক অঞ্চল ধরে সুদীর্ঘ কাল ধরে খনার মতো এত জনপ্রিয় কেউ ছিলেন না। তারপরও নারী হওয়ার কারণে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে খনার নাম নেই।"[৬] সেই খনার চরিত্রকেই নিজের কথনের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন বাণী বসু 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে। 'খনা' চরিত্রের রূপকে অবজ্ঞাত নারীর কর্ম ও বচনের কার্যকারিতার প্রকৃত তাৎপর্যকে তুলে ধরেন ঔপন্যাসিক। নারীপুরুষের চিরকালীন বিরোধের সমস্যার সমাধানসূত্র প্রদানে খনার বচনকে আশ্রয় করেন তিনি। সমস্যার সূত্রপাতকে চিহ্নায়িত করতে অতীতের দিকে তাকাতে হয় পাঠককে। এই সূত্র ধরে 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে এসেছে আদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা। জানা যায় পুরুষের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরের কাহিনি। এখানে খনার কালের থেকেও আরো অনেক পেছনে চলে যেতে হয় ঔপন্যাসিককে। সমাজতাত্ত্বিক,

নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান ও গবেষণা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ক্ষমতার বন্টন ও সাম্যের নীতিতে আলোকপাত করা হয় এ উপন্যাসে।

'খনামিহিরের ঢিপি' মাতঙ্গীর গল্প, রঙ্কার গল্প। অন্যদিকে "সর্বমঙ্গলা-বেদবতী-রঞ্জাবতী-ঈশা" - এক পরিবারের অন্তর্গত চার প্রজন্মের নারীকে পাশাপাশি রেখে শব্দ দিয়ে নারীজীবনের নকশিকাঁথা বুনে গেছেন বাণী বসু। এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈশা 'অলস' দৃষ্টি মেলে এক নির্মীয়মান ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করলে দেখা যায়, লরি ভর্তি পাথরকুঁচি মিক্সারে পেষাই চলছে। থামের খাঁচা তৈরি করে তার ভেতরটা ভরাট করা হচ্ছে। মেটে রঙের মাটি পরিণত হচ্ছে কৃত্রিম, শৌখিন বাগিচায়। মাথা তুলে সগৌরবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ঈশার মনকেমন করে উঠেছে 'স্নিগ্ধ সবুজ'-এর জন্য। তার মনে হয়েছে উন্নত প্রযুক্তির কারণে উদার-উন্মুক্ত প্রকৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। এই ছবির সূত্র ধরে ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাওয়া যায় কয়েক হাজার বছর পূর্বেকার অরণ্যচারী মানুষের সমাজ-সভ্যতায়। উপন্যাসে এভাবেই জাম্পকাট পদ্ধতিতে আদিম পাথুরে যুগের সমান্তরালে এসেছে বর্তমানের সমাজের ছবি। তখনকার সেই মানুষেরা প্রথমে ছিল যাযাবর, পশুপালক শ্রেণি। লেখিকা বলছেন, তখন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বিলাসব্যসনের কোনো স্থান ছিল না। জীবন ছিল কঠিন এবং পাথুরে। মোটা দাগের জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে প্রয়োজনই ছিল শেষকথা। একসময়ে অরণ্যচারী মানুষকে স্থিতিশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত করায় নারী। গোষ্ঠীর মনে জাগল থিতু হওয়ার বাসনা। সমাজতত্ত্ব বলছে নারীর সঙ্গে কৃষির যোগ সুনিবিড়। একদিন আদিম মানুষকে নারী কৃষিকাজ শিক্ষা করায়। কৃষিক্ষেত্র নির্মাণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গৃহনির্মাণের ঘটনাটি ঘটল তার কিছু পরে। সেকালের মানুষের বাসগৃহ নির্মাণের আদি উপাখ্যান ঔপন্যাসিক শুনিয়েছেন এই উপন্যাসের 'ভগ-অর্যমা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। 'ভগ-অর্যমা' পরিচ্ছেদে কথনশিল্পে পারদর্শী সর্বজ্ঞ কথক ঘটমান বর্তমান ক্রিয়াপদে আদিম মানুষের গৃহনির্মাণ প্রকল্প ব্যাখ্যা করেছেন। সহজ বুদ্ধিতে সে যুগের মানুষ মাটির ওপর মাটি চাপড়ে গড়ে তুলেছিল কুটির। শুকনো ধানগাছ আঁটি বেঁধে ব্যবহৃত হয়েছিল সেই কুটিরের আচ্ছাদন হিসাবে। কুটিরের ছাদকে ঢালু করা হয়। যাতে সেখানে

জলকণা জমতে না পারে। গড়িয়ে পড়ে ঢালু চাল বেয়ে। নিরাপত্তা পিয়াসী আদিম মানুষের আবাসস্থল নির্মাণের সেই প্রথম পদক্ষেপ এখন যেন এক বৃক্ষচ্ছেদী, সবুজ নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানে পরিণত হয়েছে। বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত বিলাসবহুল গৃহকোণ কতটুকু সুখ বা নিরাপত্তা দিতে পারে মানুষকে, তা নিয়ে এখানে যেন প্রশ্ন তুলেছেন ঔপন্যাসিক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ কি অনেক সময়ই মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতাটুকু শুষে নিচ্ছে না! বর্তমানের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় গৃহ আসলে পরিণত হয়েছে মানষের পদ নির্ধারণের ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতার প্রতীকে। ঈশার দৃষ্টি তাই কি 'অলস'? ক্লান্তি কি গ্রাস করেছে তাকে? সে কি ধরে ফেলতে পেরেছে সৃষ্টির, উন্নতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই সুগভীর রহস্যকে। সংবেদনশীল লেখিকা সরাসরি না বলেও, একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন আভাসে ইঙ্গিতে। 'ঈশা-নিশীথ'-এর দাম্পত্য কি তেমন কথাই বলে না! অতীত ও বর্তমানের এই দুটি ছবি পাশাপাশি রাখলে যুগাতিযুগ ধরে সংস্কৃতির ঊর্ধ্বায়ন এবং মানুষের বুদ্ধির ক্রমপরিণত রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি খোঁজ মেলে মানবমনের জটিলতারও। মানবসভ্যতার অবনমনকেও কি চিহ্নিত করে না এই চিত্র!

ঠিক এই একই কথা বলা চলে 'রন্ধন-প্রকৌশল' সম্পর্কেও। 'খনামিহিরের ঢিপি'-তে রন্ধনের যে আদি ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়, সেখানে বলা হয়েছে আদিম যুগের মানুষের কাছে খাদ্যগ্রহণ ছিল ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়-স্বরূপ। বন্যফল, আগুনে আধ-ঝলসানো পশুর মাংসই তাদের পক্ষে ছিল যথেষ্ট। এরই মধ্যে 'মধুরা'-র গোষ্ঠীর মধ্যে এক ব্যতিক্রমী নারী রঙ্কা তার সহজাত শিল্পবোধে পরিপাক বা রন্ধন প্রণালী আবিষ্কার করে ফেলে। 'ভগ-অর্যমা' শীর্ষক অধ্যায়ে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। আজকের নারী সর্বমঙ্গলাদের পূর্বসূরী, আদিম অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত রঙ্কার রন্ধনপ্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন গোত্রের। সভ্যতা সৃষ্টির সেই আদিলগ্নে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি রঙ্কা "ধান্যের ভেতরের তন্ডুল, বড় বড় কন্দ সিদ্ধ করে, খন্ড খন্ড করে তাতে ঝলসানো হরিণ বা বরাহ মিশিয়ে দেয়, লোনা মাটি মেশায়, এবং অপূর্ব স্বাদের খাদ্য তৈরি হয়।"[৭] গোষ্ঠীবাসীদের বিস্মিত করে নিজের ভাষায় এভাবে রন্ধনের সংজ্ঞা প্রদান করে আদি নারী, "আগুনের ওপর সোজা ফেলে দিলে তা পোড়ানো হয়। জল দিয়ে বস্তু আগুনে রেখে নরম করার নাম সিদ্ধ করা। উভয় মিললে রন্ধন।"[৮] এই রন্ধনপ্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা যেহেতু নারী রঙ্কা, সুতরাং অত্যাশ্চর্য রন্ধনপ্রণালীর আবিষ্কর্তা রঙ্কাকে সমীহ

করে গোষ্ঠীবাসী। এ যুগের নামজাদা রাঁধিয়ে সর্বমঙ্গলা ঠাকুরুণ যেন সেই রঙ্কারই প্রতিনিধিত্ব করছেন। রঙ্কা উদ্ভাবিত রন্ধনপ্রণালী এযুগের নারীর হাতে রন্ধনশিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। অতীত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রঞ্জাবতীর মনে পড়ে গেছে দিদিমা সর্বমঙ্গলার বুকে একটা, কোমরে একটা গামছা বেঁধে মাংস রান্না করার দৃশ্য। হেঁসেলে ইলিশ মাছের টক, কুমড়ো-বেগুন-মুলো দিয়ে মৌরলা মাছ, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, পাঁঠার মাংসের সুরুয়া রাঁধায় পটু সর্বমঙ্গলাকে রঙ্কার উত্তরসূরী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। দিদিমা সর্বমঙ্গলার মৃত্যুর পর রঞ্জাবতীর মনে পড়ে গেছে 'দিদিমার টঙের ঘর থেকে আচার চুরি করে খাওয়া'-র কথা। সর্বমঙ্গলার হেঁসেল এক অদ্ভুত স্থান। সর্বমঙ্গলার রন্ধনকার্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক চার প্রজন্ম আগেকার সময়কালকে যেমন ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, তেমনি উপরোক্ত রন্ধনপ্রণালীর বর্ণনা দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় তৎকালীন বাঙালীর ভোজনরসিক হওয়ার মূলে ছিলেন এই সর্বমঙ্গলারা, যারা হেঁশেলের গরমে দগ্ধ হতে হতেও পবিত্র চিত্তে, অন্তরের শুদ্ধতায় রন্ধনকার্য সম্পাদন করত। রন্ধন ও খাদ্যদ্রব্যের সুবিশাল ফিরিস্তি দিয়ে ব্যক্তিমানুষ সর্বমঙ্গলা নয়, একটি বিশেষ যুগকে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। ধরতে চেয়েছেন নারীর সৃষ্ট সেই শিল্প বিশেষকেও, যা সংরক্ষণের অভাবে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে এবং যা কোনোকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বীকৃতি লাভ করেনি। আর তাই রন্ধনশিল্পে সবাইকে তৃপ্ত করা নারীর নিজের কিন্তু শেষবেলায় ভাঙা সানকিতে খুদকুড়ো খেয়ে, কখনো বা একাদশীর দিন সধবাকে মাছের আঁশধোয়া জল খেয়ে দিন কেটেছে। বাড়ির কর্তা তার খবরও রাখেননি। যে নারী সভ্যতার উদ্‌গাতা, তাকে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, আঁতুড়ঘর, শোবার ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হয়েছে। এ মৃত্যু অবশ্যই দৈহিক মৃত্যু নয়। এ হল বেঁচে থাকার ইচ্ছের মৃত্যু। সংস্কৃতির অগ্রগতির এই সারসত্যটুকুই বিধৃত করতে চাওয়া হয়েছে উপন্যাসে। তাছাড়া রন্ধনের সূত্র ধরে সেকাল-একালের নারীসমাজের মধ্যে সংযোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

'সৎকার' পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষত প্রাচীনকাল ও একালের সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রনকে তুলে ধরেছেন বাণী বসু। মাত্র এই একটি পরিচ্ছেদেই 'শ্রাদ্ধ'-এর নিয়মাবলী পালনের সূত্রে দুই যুগকে পাশাপাশি রেখে পাঠককে তার শিকড়ের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছেন। কথন প্রকরণে দক্ষ বাণী বসু

এখানে একাল-সেকাল-কে সামনাসামনি রেখে যেন সরাসরি প্রশ্নচিহ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন পাঠকের দিকে যে কেন এবং কতদিন মানুষ তার আদিম প্রবণতার কাছে বশীভূত থাকবে, জ্ঞানত অথবা নিজের অজান্তেই। আদিম অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত, সরল-অপরিণত হৃদয় ও মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ লক্ষ্য করেছে গোষ্ঠীর মৃত মানুষগুলির বিদেহী আত্মার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত না করলে গোষ্ঠীজীবনে ঘনিয়ে আসে অমঙ্গলের মেঘ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে স্বাভাবিক জীবন হয় বিপর্যস্ত। সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে বাঁচতে, সম্মিলিতভাবে আদিম মানুষেরা সরল বিশ্বাসে, সরলীকৃত পন্থায় মৃত ব্যক্তিদের নাম উচ্চারণ করে, তার উদ্দেশ্যে খাদ্য-পানীয় অর্পণ করে, তার আত্মার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণে সচেষ্ট হয়। অশুভশক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এই উপায় বলে দেয় তাদের দলের সবচেয়ে সাহসী নারী রঙ্কা। নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গীভূত এই প্রথাকে তারা ‘সৎকার’ নামে অভিহিত করে। এই ‘সৎকার’ পরিচ্ছেদের অন্তিমে বলা হয়েছে যে কিভাবে সেই পুরাতন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এখনও সমাজে টিকে আছে। সর্বমঙ্গলার শ্রাদ্ধকালীন কৃতকর্মাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে অতীতের এই প্রথা বর্তমানের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজজীবনেও আশ্চর্যরকমভাবে প্রাসঙ্গিক। একদা নিছক খেলার ছলে আদিম মানুষ ‘সৎকার’ নামক যে ক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিল, এখনও তা মানুষের জীবনযাপনের আবশ্যিক অঙ্গস্বরূপ বিরাজ করছে। সমাজজীবন এখনও মান্যতা দিয়ে চলেছে সেই অতীত সংস্কারকে। প্রথার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয় উপন্যাসের এই অংশটি।

‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসে উঠে এসেছে আদিম অরণ্যজীবনের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা। সেকালে মধুরা, বর্ণা, মাতঙ্গী, রঙ্কার মত নারীরা দলনেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। গোষ্ঠী পরিচালনার দায়িত্বে থাকত নারীরাই। বৃহদাকার, বৃহৎ চক্ষু, দীর্ঘকায় পেশিবহুল, বলিষ্ঠ চেহারার এই নারীরা ছিল অস্ত্রপটু। বৎসধারণ, যুদ্ধ পরিচালনা ও সাম্যনীতি নির্ধারণের কারণে গোষ্ঠী তাদের শাসন মেনে নিত। সুবিচার ও সুশাসনে নারীর জুড়ি মেলা ভার ছিল। মস্তিষ্কজাত বুদ্ধি ও দৈহিক বলপ্রয়োগের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণসৃষ্টি ও দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষমতা নারীকে নেত্রীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রন্ধন, সূক্ষ্মবস্ত্র নির্মাণ, ঔষধাদি প্রস্তুতিকরণের ন্যায় শিল্পবোধসম্পন্ন কর্মেও নারীরা ছিল পারঙ্গম। যুগাতিযুগ ধরে নারীর মধ্যে

সেই ধারা প্রবহমান। তাই আজকের দিনেও নারীরা ক্ষমতার রাশ নিজের হাতে নিতে চায়। এ তাদের জিনের অন্তর্গত স্বাভাবিক প্রবণতা। নিজের সংসারে সর্বমঙ্গলা ঠাকুরুণই ছিলেন সর্বেসর্বা। অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী নারী তিনি। অন্দরমহলে নিয়মনীতির ক্ষেত্রে তিনি হলেন 'মাদার ফিগার' স্থানীয়। রঞ্জাবতীর মনোভাব দিদিমা সর্বমঙ্গলা সম্পর্কে এরকম, "কোনও মেয়ের যদি মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস খুব বেশি থাকে তাহলে সে তার যুক্তি বুদ্ধি এসব স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে। কিছু কিছু লোক তাকে বাড়ির বড়সাহেব কি ডেপুটি কিংবা জাঁহাবেজে ইত্যাদি বললেও সে তার অস্তিত্ব চমৎকার টিকিয়ে রেখে নিজের সংসারের মঙ্গল করতে পারে, যেমন দিদিমা সর্বমঙ্গলা"।[৯] ঘটন-অঘটন পটিয়সী এই নারীর কথাই বাগবাজারের বাড়িতে শেষকথা ছিল। অসংখ্য সন্তানের জন্মদাত্রী সর্বমঙ্গলা স্তন্যদান ও সন্তান মানুষ করা, সংসারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি আপন বুদ্ধিমত্তায় সংসারের ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। জন্মদাত্রী, মহাপালিকাই শুধু নয়, তিনি ছিলেন মহাসেবিকাও বটে। রোগীর সেবাশুশ্রূষায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তারপর এই ধারা বাহিত হয়েছে কন্যা বেদবতী, তাঁর কন্যা রঞ্জাবতীর মধ্যে। এই নারীরা সেই দায়িত্বই পালন করেছেন, আদিম যুগে যে ভূমিকায় ছিলেন মাতঙ্গী, মধুরা, রঙ্কা। অতীতে রঙ্কার মত নারীরা শক্তিমতী, অস্ত্রধারিণী হওয়া সত্ত্বেও মানবিকতায় ও নারীসুলভ মমতায় নিমেষের মত কুটিল, ক্রুর, দুষ্টের সেবা থেকে বিচ্যুত হয়নি। অর্থাৎ এইসব চরিত্রের নির্মাণ ছিল কঠিন-কোমলের মিশ্রণে। এখনো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং তুলনামূলক বিচারে বলা যেতে পারে পাথুরে যুগের নারীদের থেকেই এ যুগের নারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নারীত্বের জিনগত কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থের নিবিড় পাঠে সেই সত্যকেই উঠে আসতে দেখা যায় 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে।

'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসের প্রাগৈতিহাসিক পর্বটিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে 'মায়েতে মেয়েতে কর্তৃত্ব নিয়ে ঝগড়া'-এর বেশ কিছু নজির রয়েছে। এ হল একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত দুই নারীর ক্ষমতা দখলের লড়াই। একবার যেমন মধুরা অসুস্থ হলে দলের অপর শক্তিমতী নারী বিধা তার স্থান অধিকার করতে পারবে ভেবে আনন্দিত হয়েছিল, "বিধা ভেবেছিল মধুরা মারা যাবে। সে মধুরার স্থান নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। হল না। বিধা খুব নিরাশ হয়।"[১০] দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে সুজলার সঙ্গে তার কন্যা

বর্ণার রেষারেষি চরমে পৌঁছেছিল। এক নারীর মৃত্যু, তথা অপসারণ অপর নারীর ক্ষমতাস্থাপনের পথকে প্রসারিত করত তখনকার দিনে। 'নিমেষ' শীর্ষক অধ্যায়ে ভগ রঙ্কাকে এক গোপন তথ্য প্রদান করেছে। তার থেকে রঙ্কা জানতে পারে যে শক্তিময়ী, মমতাময়ী, শিল্পবোধসম্পন্না যুবতী নারী রঙ্কাকে দলনেত্রী মধুরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে। প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাকে। রঙ্কার মধ্যে কিন্তু ক্ষমতালাভের আকাঙক্ষা জন্ম নেয়নি কখনও। সে নিজের জীবন ও জগতের নিশ্চিন্ত, সীমাবদ্ধ পরিসরে থাকতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। তবু মধুরার অভিজ্ঞ চোখ রঙ্কাকে নিজের উত্তরসূরী হিসাবে চিনতে পেরেছে। রঙ্কার মধ্যে সম্ভাবনা লক্ষ্য করে স্পষ্টতই সে রঙ্কাকে বলেছে, "...এমন দিন আসতে পারে, যেদিন তুমিই আমাকে পরাজিত করে নেত্রী হয়ে বসবে। তেমন হবার আগেই আমি সরে যেতে চাই।"[১১] এ যেন সম্মুখসমরে পরাভবের পূর্বেই এক নারীর অন্য নারীর সামনে নতিস্বীকার ও আত্মসমর্পণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবেই সেই অরণ্যজীবনে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দুই ক্ষমতালিপ্সু নারীর মধ্যে উচ্চপদপ্রাপ্তি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সংঘাত বাঁধত। কখনো সর্বজনসমক্ষে শক্তির পরীক্ষা দিয়ে নারীকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হত। কখনো বা আপাত শান্তিমূলক সহাবস্থান সত্ত্বেও এক নারীর মনে অপর নারীর প্রতি জন্ম নিত অসূয়াবোধ। দুই নারীর এই 'রেষারেষি' যে এ প্রজন্মের নারীদের মধ্যেও উত্তরাধিকার সূত্রে সেই একইভাবে বর্তায়, এই সত্যই উচ্চারিত হয়েছে উপন্যাসে। সমাজ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক অনুবর্তনকেই এক্ষেত্রে সুচিহ্নিত করতে চেয়েছেন কাহিনীকার। তিনি বলেছেন সর্বমঙ্গলা ও তাঁর পুত্রবধূদের মধ্যেকার ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বের কথা। সর্বমঙ্গলা সারাজীবন তাঁর পুত্রবধূদের ওপর জোর খাটিয়ে গেছেন। নিয়ম জারি করেছেন তাদের চলাফেরায়, ওঠাবসায়। সেজবউ প্রমীলার মধ্যেও কিন্তু ছিল যোদ্ধৃভাব। তাই তিনি নীরবে শাশুড়ির নির্যাতন সহ্য করেননি। শাশুড়ির চোখের সামনেই ভালো খাওয়া, ভালো পরার সু-অভ্যাসটি বজায় রেখেছেন। প্রকাশ্যে স্বামী, ভাশুর, দেওর, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন শাশুড়িকে দেখিয়ে দেখিয়ে। গ্রীষ্মের দুপুরে সর্বমঙ্গলার নির্দেশ অমান্য করে প্রমীলা 'ফট করে ঘোমটা খুলে ফেলতেন'। চোখে কাজল, গালে পাউডার লাগিয়ে 'জাঁহাবেজে' মেয়েমানুষ প্রমীলা সর্বমঙ্গলার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করতে চাইলে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভবনায় প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে সর্বমঙ্গলা বলে বসতেন,

"বউমানুষের অত সাজগোজ! অত চোখে কাজল, গালে পাউডার কী গো! সবসময়ে যেন নেচে আছে! ঘরের আয়নাগুলো এবার লোক ডেকে ভেঙে দোব।"[১২] এই যুগের সর্বমঙ্গলার মধ্যে যেন সুজলা-বর্ণার ছায়া প্রত্যক্ষ করা যায়। রঞ্জাবতী প্রমীলার এই কর্তৃত্বস্থাপনের প্রয়াসকে অন্যায় বলে ভাবতে পারেননি। বরং তাঁর মনে হয়েছে, "অন্যরা মেনে নিয়েছে মুখ বুঁজে। আড়ালে গজগজ করেছে। সেজমামি সোজাসুজি প্রোটেস্ট করেছেন। নিজের অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছেন। না দিলে তো কেড়ে নিতেই হবে।"[১৩] দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সর্বমঙ্গলার হাতের চাবিকাঠিটি ক্রমশ একসময় হস্তগত হয়েছে সেজমামি প্রমীলা কর্তৃক। আর তারপর তা চলে যায় ছোটমামির হাতে। পরবর্তীকালে ছোটমামি ও ছোটবৌদি পূর্ণার মধ্যে ওই দ্বন্দ্বকে সঞ্চারিত হতে দেখেছেন রঞ্জাবতী, "...এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সেজমামির ছোট পুত্রবধূ পূর্ণা, সম্পর্কে আমার মামাতো বৌদি হল, যদিও ছোট, দুজনের মধ্যে খুব গোপন একটা রেষারেষির খেলা চলছে।"[১৪] অন্যদিকে বেদবতীর নিজের হাতে গড়ে তোলা সংসারে তাঁর কর্তৃত্ব নেই বিন্দুমাত্র। তাই অফিসফেরতা কন্যার পাতে লুচি-আলুভাজা তুলে দিতে গেলে তাঁকে পুত্রবধূর সম্মতির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ঈশার সঙ্গে তার শাশুড়ির সম্পর্কও প্রতিদ্বন্দ্বিতার। দুর্বলতম প্রতিপক্ষ ঈশার ওপর দমননীতি প্রয়োগ করে নিজের ক্ষমতার জোর খাটিয়ে থাকেন নিশীথ ঘোষালের মা।

আজকের দিনে দল নেই, নেই গোষ্ঠীজীবন। তাই সংসারের ক্ষুদ্র বৃত্তে এভাবেই ক্ষমতার দখল নিতে পেরে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন মাতৃস্থানীয়া এই নারীরা। 'খনামিহিরের ঢিপি'-এর এই টুকরো টুকরো ছবিকে পাশাপাশি রেখে কোলাজ বানিয়ে দেখলে মনে হবে জ্ঞান-শিক্ষা-সভ্যতা-আধুনিকতা জাতীয় শব্দগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করার সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, একবিংশ শতকের নারীরা আদতে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'দুই নারী মধ্যবর্তী ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব'-কে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেনি। আবহমানকাল ধরে নারীদের মস্তিষ্কের কোটরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে কর্তৃত্বস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ও সর্বোচ্চ পদপ্রাপ্তির বাসনা। আদিম, বন্য সেই প্রবৃত্তি আজ পাথরচাপা পড়ে রয়েছে মাত্র। কিন্তু শিক্ষা, আধুনিকতা, সংস্কৃতির প্রলেপ সত্ত্বেও সমূলে উচ্ছেদ করা যায়নি তাকে। তা যেমন সেযুগের নারীদের জীবনের ট্র্যাজেডি ছিল, তেমনি এই যুগের সর্বমঙ্গলা, পূর্ণা, বেদবতী,

প্রমীলা, ঈশাদের ক্ষেত্রেও চরমতম সত্য। সময়-সুযোগ মতো পুরুষ সমাজ সেই ‘দ্বন্দ্ব’ -কে কাজে লাগিয়েছে কেবল, নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের রসায়নকে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের আলোকে এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে চেয়েছেন বাণী বসু ‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসে। এই গ্রন্থে দুই ভিন্ন সময়কালের তুলনা-প্রতিতুলনার মাধ্যমে এই সত্যও উঠে এসেছে যে যুগাতিযুগ ধরে সমাজে ‘লিঙ্গ রাজনীতি’ আপন আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে, যেখানে পুরুষ অত্যাচারী, অবদমনকারী ও নারী অত্যাচারিতের বা অবদমিতের ভূমিকা পালন করে আসছে।

“সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মাতৃত্ব যখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে, নারীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা মা হওয়া-এই প্রচার যখন থেকে পল্লবিত হয়েছে...তখন থেকেই মাতৃত্ব নারীকে পিছিয়ে দিয়েছে। পেছতে পেছতে একদা মুক্ত সঞ্চরণশীল উপার্জনকারী স্বাধীন নারী যে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছে তার নাম হারেম, অন্তঃপুর, অন্দরমহল, প্রাইভেট ডোমেইন। তার নাম পরিবার।”[১৫]— বিশদ সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকলেও, মল্লিকা সেনগুপ্ত কৃত উপরোদ্ধৃতি পাঠ করলেই নারীর অবস্থান্তরের প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ‘মাতৃত্ব-পরিবার’-এই প্রতিষ্ঠান নারীকে পরিণত করল সম্পদে। এই সত্যের ছায়া পড়েছে বাণী বসু সৃষ্ট আদিমানবী রঙ্কা চরিত্রে। পুরুষের বৈধ সন্তানের আকাঙক্ষা, ‘পরিবার’ –এর প্রাতিষ্ঠানিক কারাগার নারী রঙ্কার জীবনকে করেছে দুর্বিষহ। রঙ্কা প্রতিভাবান। বুদ্ধিমতী। সেবাময়ী। বলবতী। সৃজনীশীল। মুক্ত সঞ্চরণশীল স্বাধীনা নারী। কূটবুদ্ধি প্রয়োগে রঙ্কাকে ‘নিমেষ’ নাম্নী পুরুষ বলপ্রয়োগ করে সহবাসে বাধ্য করেছিল। শক্তিমতী নারীকে পশুর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চেয়েছিল, “...গোঁয়ার রঙ্কাকে বশ করতে পারলো না। তাকে সবসময়ে বেঁধে রাখত। হাতের কবজিতে বাঁধন, পায়ের গোছে বাঁধন, গলায় পর্যন্ত একটা আলগা বাঁধন গোরুর মতো।”[১৬] নিশীথ ঘোষালের স্ত্রী, রঞ্জাবতীর কন্যা, এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ঈশা-র মধ্যে অত্যাচারিতা রঙ্কার ছায়া লক্ষ করা যায়। বোঝা যায়, কয়েক হাজার বছর পরেও নারী এখনো এই বন্ধনদশা ছিন্ন করে উঠতে সক্ষম হয়নি। আর তাই নিশীথের মতো পুরুষেরা নিশ্চিন্ত মনে বলপ্রয়োগ করে যেতে পারে, “সে এসেছিল স্ত্রীর সীমাহীন স্পর্ধায় ফুঁসতে ফুঁসতে। সে

গালি দিয়েই যাবে, দিয়েই যাবে। তার স্ত্রী কেঁদেই যাবে, কেঁদেই যাবে। সে বেঁধে মারবে, তার স্ত্রী মার খেয়েই যাবে, খেয়েই যাবে।”[১৭] এই ‘মার’-এর চিহ্ন নিজের দেহে ধারণ করেছিল রঙ্কা। আর আজকের উন্নয়নশীল দেশে, আধুনিকা নারীরা পুরুষের ‘মার’-এর চিহ্ন হৃদয়ে গোপন করে মেনে-মানিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করে। মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিতে দেখলে চোখে পড়বে তাদের ‘হাতে কড়া, পায়ে কড়া, গলায় গরুর দড়ি’। ঈশার মধ্যে যেমন অরণ্যনারী রঙ্কার অসহায় রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি পরম শক্তির আধার রঞ্জাবতী যেন রঙ্কার সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনীশীল সত্তাটিকে ধারণ করে আছে। ‘রঙ্কা’ আসলে যেন এক প্রতীকী নারী, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যে আসলে ছড়িয়ে রয়েছে সর্বমঙ্গলা, বেদবতী, রঞ্জাবতী, ঈশা এবং এরকম আরো অনেক নারীর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত রঙ্কা এবং রঞ্জা – দুই বিপুল সম্ভাবনাময়ী নারীকে কালের অতলে তলিয়ে যেতে হয়েছে। তাদের কথা আসলে মনে রাখে না সমাজ। যেমন সমাজ মনে রাখেনি খনামিহিরকে। সম্ভাবনাময়ী এই নারীদের পরিণতি দেখে মনে হয় আবহমানকাল ধরে প্রকৃতপক্ষে নারীর অবস্থান্তর ঘটেনি কোনো, কেবল খাতায়-কলমে লেখা হয়েছে নারীমুক্তির কিছু বানিয়ে তোলা গল্প। বাস্তবচিত্রটি আসলে একেবারেই আলাদা। এই সত্যই ‘খনামিহিরের ঢিপি’-র মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে।

জীবন এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কসূত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে বলেছেন, “সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত – সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য ব’লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার।”[১৮] সংস্কৃতির গতিময়তার এই অকাট্য যুক্তিকে মেনে নিয়েই বাণী বসুর এই উপন্যাস এক বিশেষ সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে। মানুষ বদলায় না। সে কেবল ফিরে ফিরে অতীতের বুকে আশ্রয় খোঁজে। বর্তমান জীবনযাত্রায় ধরা পড়ে কেবলমাত্র তার বাহ্যিক পরিমার্জিত, পরিশীলিত রূপটি। সূচিশিল্প, রন্ধনশিল্প, গৃহনির্মাণ, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু-সৎকার, একান্নবর্তী পরিবারব্যবস্থা, একক নিউক্লিয়ার পরিবার, নারীপুরুষের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক— প্রাত্যহিক জীবনযাপনের অঙ্গ এই বিষয়গুলিকে খুঁটিয়ে দেখলে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে আদিম পাথুরে

যুগের ঐতিহ্যকে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে অতীতের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে জেনে নিতে পারলেই বিংশ বা একবিংশ শতাব্দীর সমাজ, সংস্কৃতির ভাঙন বা পুনর্গঠনের গোড়ার কথা বুঝে যাওয়া যাবে। বোঝা যাবে, বহিরঙ্গ বিচারে তৎকালীন ও সাম্প্রতিক জীবন, তথা জীবনবোধে অনেকটা ফারাক থাকলেও, বহুলাংশেই সেই আদিম, অরণ্যজীবনের নিয়ম-নীতিগুলিই রং-রূপ বদলে আজকের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, 'খনা' চরিত্রের মিথকে আশ্রয় করে এই চরম সত্য উচ্চারণ করে ঔপন্যাসিক।

আহমদ শরীফ তাঁর 'সংস্কৃতি ভাবনা' গ্রন্থে প্রবহমান সংস্কৃতিকে সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আপন বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকালে তিনি বলেছেন, "সংস্কৃতি দেশ-কাল-জীবনের প্রাত্যহিক চাহিদাঅনুগ প্রবহমান জীবনধারার পরিব্যাপ্ত রূপ বলেই তা গতিশীল ও সদাপরিবর্তমান। সংস্কৃতিকে তাই বহতানদীর সঙ্গেই তুলনা করা চলে।...সংস্কৃতি রূপ বদলায়, রং বদলায়, ঢঙ বদলায় – বহুরূপীর মতো রূপান্তরেই তার গতিশীলতা-প্রবহমানতা সদাপ্রমাণিত।"[১৯] সংস্কৃতি সত্যিই হয়তো নদীর মতো সম্মুখভাগে এগিয়ে চলে। চলার ছন্দে দু-ধারের পাড় ভেঙে সে পরিবর্তন করে নেয় চলার খাত। দুটি ভিন্ন যুগকে পাশাপাশি রেখে 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে সংস্কৃতির প্রবহমানতার সেই গ্রাফই অঙ্কন করা হয়। সকল পুরাতনী ঐতিহ্যেরই যে পুনরাবৃত্তি হয় না, যুগের দাবি মিটিয়ে কিছুটা হলেও নবপ্রজন্ম নিজস্ব গতিপথ নির্মাণে অগ্রসর হয়, ওই বহতা নদীরই মতো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই উপন্যাসের উপসংহার পর্বে এসে। অরণ্যনারী রঙ্কা নিজেকে নিমেষের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পারেনি কন্যা মাতঙ্গীকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করতে। আজকের এই একবিংশ শতকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ঈশা কিন্তু শাঁখের করাতের মতো কাটতে কাটতে একদিন সাহস সঞ্চয় করে নয় বছরের দাম্পত্যের মিথ্যা মোহ ছিন্ন করে কন্যা শায়েরীকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্যতর জীবনের সন্ধানে। পাশে পেয়েছে পরিবারকে। স্বর্গের অমরাবতী রচনা নয়, মর্ত্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলার নারীর এই অঙ্গীকার 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসের পাঠককে শেষ পর্যন্ত আশাবাদের সন্ধান দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস,* জিজ্ঞাসা, জানুয়ারি ২০০৩ (চতুর্থ প্রকাশ), পৃ. ১৪
২. দেবী জ্যোতির্ময়ী, 'আমার কথা' ('এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের ভূমিকা), *জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন,* প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৫
৩. হোসেন সেলিনা, *ঘরগেরস্থির রাজনীতি,* কারিগর, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১১৯
৪. সেনগুপ্ত মল্লিকা, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৫২
৫. সেনগুপ্ত মল্লিকা, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০
৬. হোসেন সেলিনা, *ঘরগেরস্থির রাজনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৭. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ১২৫-১২৬
৮. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৯. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১০. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১১. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
১২. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৩. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১৪. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১৫. সেনগুপ্ত মল্লিকা, *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪৮
১৬. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৭. বসু বাণী, *খনামিহিরের ঢিপি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
১৮. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৯. শরীফ আহমদ, *সংস্কৃতি ভাবনা,* ঢাকা, উত্তরণ, মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৫৯

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস* , কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, জানুয়ারি ২০০৩ (চতুর্থ প্রকাশ)
২. চন্দ, পুলক (সম্পাদনা)। *নারীবিশ্ব* , কলিকাতা : গাঙচিল, জুলাই ২০০৮

৩. দত্ত, সম্রাট। *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস,* কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০
৪. ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য। *কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস* , কলিকাতা : ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১
৫. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন অপ্রাচীন* , কলিকাতা : কিশলয় প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৮
৬. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ,* কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (প্রথম সংস্করণ)
৭. সেনগুপ্ত মল্লিকা। শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ)
৮. হোসেন সেলিনা। ঘরগেরস্থির রাজনীতি, কলিকাতা : কারিগর, জানুয়ারি ২০১৩
৯. শরীফ, আহমদ। *সংস্কৃতি ভাবনা,* ঢাকা : উত্তরণ, মার্চ ২০০৪

রান্নাপুজো : একটি লোক-সাংস্কৃতিক পরম্পরা

ড. সুধাংশুকুমার সরকার

সংক্ষিপ্তসার : প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের সরণি বেয়ে ভারত আজ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সময়ে উপস্থিত হয়েছে। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে ভারতীয় উপমহাদেশ বাঙালি, অসমিয়া, মণিপুরি, নাগামিস, ত্রিপুরী, উড়িয়া, বিহারি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, কন্নড় ইত্যাদি জনগোষ্ঠী ও ভাষাভাষী মানুষের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কলতানের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আবার প্রত্যেকটি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে বিশেষ গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এই সব আঞ্চলিক ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ভারত তথা বিশ্বের মানব ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক মতবাদের পাশাপাশি গুরুবাদেরও দেশ বটে। গুরু পরম্পরার বিভিন্ন উজ্জ্বল নিদর্শন আজও সমাজে বিদ্যমান। তবে কে-কবে-কখন-কোথায়-কীভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা সূচিত করেছিল তা সঠিক জানা না গেলেও আজ জানবার আগ্রহ সর্বত্র। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুগে এই জানবার আগ্রহটা আমাদের দারুণ ভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। রানির রাজত্বে ব্রিটিশ সাহেবদের ভারতীয় সমাজ জীবন ও ভাষা সম্পর্কে যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল সেটা সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মধ্যেও ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা তৈরি করেছিল।

সেই পরম্পরাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বাঙালির ‘রান্নাপুজো : একটি লোক-সাংস্কৃতিক পরম্পরা’ এই শিরোনামের আলোকে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচনার চেষ্টা করব। রান্নাপুজো কে, কবে, কখন প্রচলন করেছিলেন তা আজ জানা না গেলেও পুজোটি এখনও মফস্‌সল ও গ্রামীণ জনপদে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে সহৃদয় পাঠক তার কতকটা আন্দাজ করতে পারেন বলেই অনুমান হয়। রান্নাপুজো আসলে মা মনসার পুজো। মা মনসা

দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই পুজো করা হয়। এখানে মনসার মূর্তির পরিবর্তে সিজ-মনসার ডালে পুজো হয়ে থাকে। কেন? পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এই পুজো গণ উৎসবের রূপ নেয়। কেউ কেউ দেবী মনসাকে মিশরের আইসিস দেবীর সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, জীবন যতটা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি অদেখা থেকে যায়। জীবন যতটা স্পষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি অস্পষ্ট। জীবনের এই অজানা অদেখা অস্পষ্টতাকে অনেক বেশি স্পষ্টতর করে লোকঐতিহ্য ও পরম্পরা। তবে তা বুঝবার জন্য একটু মনোযোগী হওয়া চাই। অমনোযোগী পাঠক বা জীবনের কাছে তা অজানাই থেকে যায়। আমরা শুধু একটি বিষয় এখানে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে চাই— আমরা যে ধান-দুব্বো দিয়ে ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করে থাকি, সেখানে ধান-দুব্বোই বা লাগে কেন? ধান-দুব্বোর পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়েও তো আশীর্বাদ করা যেত কিন্তু তা হয় না কেন? সুতরাং এটা একটি পরম্পরা বা ঐতিহ্য। এখন প্রশ্ন হল, আমরা এই ঐতিহ্যকে মানি কিন্তু অনেকেই জানি না। আমাদের মনে হয় এই জানাটাই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকে জানা।

সূচক শব্দ : জনগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা, মনসা, জাদু, উর্বরতা, মনসা, সমাজজীবন, উৎসব-ব্যসন ইত্যাদি।

রান্নাপুজো কে কবে কখন প্রচলন করেছিলেন তা আজ জানা না গেলেও পুজোটি এখনও মফস্বল ও গ্রামীণ জনপদে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে সহৃদয় পাঠক তার কতকটা আন্দাজ করতে পারেন বলেই অনুমান হয়। রান্নাপুজো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেই আমাদের প্রকল্পধৃত প্রবন্ধ ‘রান্নাপুজো : একটি লোক-সাংস্কৃতিক পরম্পরা’ শিরোনামের অবতারণা।

রান্নাপুজোর সময়কাল :

রান্নাপুজোর মূল বিষয় হল ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রান্না করে আশ্বিন মাসে খাওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে ‘ভাদ্রে রেঁধে আশ্বিনে খায়’। প্রথমে মহিলারা গঙ্গায় স্নান সেরে শুদ্ধাচারে পুজোয় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ যোগাড় করে

নিষ্ঠা ভ'রে পালন করে থাকে। পূর্বদিনের অর্থাৎ সংক্রান্তির আগের দিনের রান্না করা সমস্ত রকম রান্না একটি একটি করে তোলে রেখে দেওয়া হয়। আর রান্না ভাতকে জল ঢেলে পান্তা করা হয়। সেই রান্না করা সমস্ত ব্যঞ্জনাদি পরের দিন উনুনের সামনে নিয়ে এসে মা মনসাকে পূজন করা হয়। সংক্রান্তির দিন আগত নিমন্ত্রিতদের দেবীর প্রসাদ হিসেবে ওইসব অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করা হয়। কেউ কেউ অবশ্য এই প্রসাদ ভক্ষণকে পারণ ভাঙাও বলতে চেয়েছেন। রান্নাপুজো আসলে একই সঙ্গে উনুন আর মনসার স্মরণের পুজো। সে আলোচনায় পরে আসব। তার আগে বলব রান্নাপুজো আক্ষরিক অর্থে অগ্নি না জ্বলানোর পরব যা অরন্ধনেরই কাহিনি। অন্যদিকে প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করা জনপদ তাদের শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে পান্তাভাতের খাওয়া শুরু করেন। পান্তা যে গরমের প্রাতঃকালে কতটা উপকারী সে ব্যাপারে সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই একমত হবেন।

রান্নাপুজোর যে অনুষ্ঠানটির কথা বলা হচ্ছে তারও আবার কয়েকটি পর্যায় আছে। প্রতিটি পর্যায়ে এই অরন্ধন বিষয়টি রয়েছে। তথ্যদাতার মতে, এই অরন্ধনের চারটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম অরন্ধন জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমীতে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় অরন্ধন দিন হল শ্রাবণ সংক্রান্তি; অত্র অঞ্চলে 'ঢেলাফোলা' নামেও পরিচিত। অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলাতে 'খইধরা' উৎসব এবং বর্ধমান জেলাতে 'খইদই' উৎসব নামে পরিচিত। এই তিথিতে গৃহস্থের বাড়িতে অরন্ধনের জন্য দিনটি খই মুড়ি দুধ দই ইত্যাদি খেয়ে কাটাতে হয় তাই এমন নাম বলে অনেকে ধারণা পোষণ করেন। আবার পূর্ববঙ্গে সরাসরি মনসা নামেই পুজোর চল আছে। যদিও সেখানে অরন্ধনের বিষয়টি নেই। তাঁদের অরন্ধন পর্বটি অন্য সময়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। তৃতীয় অরন্ধন অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্রমাসের যেকোনো শনি বা মঙ্গলবারে। এখানে তিথি নির্ধারণ সম্পূর্ণ গৃহস্থের ইচ্ছাধীন। এতদঞ্চলে এই পার্বণটি 'চচ্চড়ি পুজো' নামে লোক-প্রচলিত। মনসাতলায় গিয়ে এদিন পুজো দেওয়ার নিয়ম। আর চতুর্থ অরন্ধন পর্যায়টি হল 'রান্নাপুজো' নামে লোকপ্রচলিত।

পাঠক লক্ষ করবেন পুরো অরন্ধন পর্যায়টি বাংলার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে সময়ে এই বাংলায় সবচেয়ে বেশি সর্পের উপদ্রব ঘটে। তাই "জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা থেকে শুরু হয়ে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থাকে। প্রতিপর্বে অরন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে

দেবী মনসার জাগ্রত মহিমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১] গ্রীষ্মপ্রধান বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে সর্পের উপদ্রব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং তজ্জনিত কারণে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মা মনসাকে স্মরণ করতে যে এই পুজোর আয়োজন তাতে কোনো সংশয় থাকে না।

উল্লেখ্য, এছাড়াও আরো একটি রান্নাপুজোর সংবাদ মেলে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলায়[২]। এই উৎসব বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে মাছের পরব নামে খ্যাত। স্থানীয় ভাষায় 'সিজানো' নামেও পরিচিত। সিজানো অর্থাৎ, সেদ্ধ করা। শব্দটির ধ্বনি পরিবর্তনের ক্রমটি হলো সিদ্ধ > সিদ্‌ধ > সিজ্‌জ > সিজা। আমাদের অনুমান এই উৎসবে গোটা সেদ্ধ করে খাওয়ার নিয়ম থেকেই সিজানো কথাটি এসে থাকতে পারে। আর মাছের পরব বলবার কারণ হল সারাবছর মাছ খেলেও এই বিশেষ দিনটির জন্য সকলে অপেক্ষা করে থাকে। এই পুজোর নৈবেদ্য হিসাবে মাছের পদাধিক্য লক্ষ করা যায়। আসব সে প্রসঙ্গে। তার আগে জেনে নিই কখন কীভাবে এই পরবটি উদ্‌যাপন করা হয়। এই ব্রতটি প্রতি বছর মাঘমাসে শুক্লা শ্রীপঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানেও যথারীতি আগের দিন রান্না করে পরের দিন পুজো করা হয়। সুতরাং এট অরন্ধনের উৎসবও বটে। আগের দিন ঘরদোর লেপাপোছা করে উনুনে একের পর এক সুস্বাদু পদ রান্না হয়। সেখানে আলুভাজা, বেগুনভাজা থেকে শুরু করে পালং শাক, বাঁধাকপি, মাছের ঝোল, মাছের ঝাল, মাছের টক, চাটনি এবং সবশেষে শুদ্ধ কাপড় পরে গোটাসেদ্ধ করা হয়।

রান্না শেষ হয়ে এলে ওইদিন রাতেই বাড়ির মা-মেয়েরা শিল নোড়া ধুয়ে তাকে নতুন গামছা দিয়ে সাজিয়ে দেবীরূপ দেওয়া হয়। ইনিই মা ষষ্ঠী। পরের দিন অর্থাৎ, অরন্ধনের দিন সকালে বাঁশ পাতা, দল ঘাস, শামুক সহ সিঁদুর, দই, হলুদ আর কাজলের ফোঁটা দিয়ে শিল-নোড়াকে পুজোর উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। নৈবেদ্য হিসেবে পান্তাভাত, গোটা সেদ্ধ, আর যতরকম রান্না হয়েছে সবরকম থরে থরে সাজিয়ে দেওয়ার নিয়ম। ধূপ-ধুনো, প্রদীপ, শঙ্খ আর হুলুধ্বনিতে পুজোর পরিবেশকে মায়াময় করে তোলে। এবার বাড়ির সবাইকে সেই দই হলুদের ফোঁটা কপালে দিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। সবশেষে আত্মীয়-পরিজন সকলকে নিয়ে মা ষষ্ঠীর ভোগপ্রসাদ খাওয়ার পালা। বলাবাহুল্য, এই

অঞ্চলের রান্নাপুজোর দেবীর সঙ্গে হাওড়া মেদিনীপুর অঞ্চলের রান্নাপুজোর দেবীর পার্থক্য বিদ্যমান।

উপকরণ :

রান্না পুজোয় কচু, নারকেল, পায়েস, ভাজা পিঠে, চালতা, তাল, পান্তাভাত, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ, কাঁচা তেঁতুল, নানারকমের তরিতরকারি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রান্নাপুজোর পুরোহিত :

এই উৎসবটি মূলত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই করে থাকে। কাজেই উপাসনা ও পুজোর্চনা মূলত গৃহস্থ বধূরা নিজেরাই করে। এরজন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ে না। আজকাল অবশ্য কোথাও কোথাও পুরোহিত ব্রাহ্মণ দিয়েও পুজো করা হয়ে থাকে। গৃহস্থের কল্যাণের জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। মাটির উনুনকে ভালো করে পরিষ্কার করা হয়। তার উপর আল্পনা কেটে উনুনকে সাজিয়ে তোলা হয়। এরপর উনুনের উপর মনসার ডাল দিয়ে পুজো করবার রীতি। কোথাও কোথাও অবশ্য দেবী মনসার মূর্তি গড়েই এই পুজোর প্রচলন আছে। উল্লেখ্য, এদিন অরন্ধন হিসেবে দিনটি পালন করা হয়। সুতরাং বলা চলে উনুনকে বিশ্রাম দেওয়ার দিন হল এই রান্নাপুজো। এখন প্রশ্ন হল, কেন উনুনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়? অবশ্য তারও একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আছে। সেটা জানা থাকলে এই পুজোর সঙ্গে মনসার সম্পর্কটি সহজেই বোঝা যাবে।

রান্নাপুজো ওরফে দেবী মনসার পুজো :

রান্নাপুজো আসলে যে মনসারই পুজো সে সম্পর্কে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ তারাপদ সাঁতরা জানাচ্ছেন যে, "দেবী সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী, সুতরাং সর্পকুলের মনোতুষ্টির মধ্যেই দেবীর আনন্দ। ঘোর বর্ষায় সর্পকুল আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করছে এবং শেষ পর্যন্ত গৃহস্থের রন্ধনশালায় একটা আশ্রয়ও মিলেছে। তাই আজ রন্ধন বন্ধ। গৃহস্থ আজ এই সর্পকুলের দেবতা মনসার উপাসনায় ব্যস্ত। মনসা-কল্পনায় কাদার একতাল মাটির ওপরে গৃহস্থ বধূরা বসিয়ে দিয়েছেন ছোট্ট একটি সিজ-মনসার ডাল। তারপর দেবীর কাছে কামনা ও প্রার্থনার পালা।"[৩]

মূলত কৃষিপ্রধান বাংলায় বাঙালির সর্বক্ষণের বিচরণ ক্ষেত্র জল-জঙ্গল-জমি। সুতরাং একদিকে সর্পাঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে যেমন দেবী মনসার আরাধনা, অন্যদিকে স্বামী সন্তান নিয়ে নিরুপদ্রব ভাবে গৃহীজীবন অতিবাহিত করাও এই রান্নাপুজোর একটি উদ্দেশ্যে। তবে তার পাশাপাশি আরও একটি উদ্দেশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আর তাহল অনুকরণাত্মক যাদু বিশ্বাস বা ফার্টিলিটি কাল্ট। দেবী মনসাকে প্রজননতন্ত্রের দেবী বলা হয়। কারণ সর্পকুলের প্রচুর বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। তদ্রূপ কোনোরূপ ক্ষতিসাধন ছাড়া যাতে গৃহীজীবন ধনে বংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সে কামনা থেকেও ঊর্বরাতন্ত্রের দেবী মনসার আবাহন এবং তার থেকেই রান্নাপুজোর প্রচলন হয়েছে বলে আমাদের প্রতীতি জন্মে।

তথ্যসূত্র :

১. সাঁতরা, তারাপদ- হাওড়া জেলার লোক-উৎসব, বাগনান আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, ২০০৫, হাওড়া-৭১১৩০৩, পৃ-৭৩
২. তথ্যদাতা- ড. চণ্ডীচরণ মুড়া, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলকাতা।
৩. সাঁতরা, তারাপদ- হাওড়া জেলার লোক-উৎসব, বাগনান আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, ২০০৫, হাওড়া-৭১১৩০৩, পৃ-৭৩

সাক্ষাৎকার :

বরুণা দাস (৫০)
স্বামী: রঞ্জিত দাস
বাণীপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া
কৃতজ্ঞতা- স্নেহা দাস

লেখক পরিচিতি

ড. নিতাই জানা : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

ড. পরিমল মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়।

কাবেরী মণ্ডল : ছাত্রী, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্ষা মণ্ডল : ছাত্রী, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

সুপর্ণা মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়।

সোমনাথ রায় : সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়।

সুস্মিতা নস্কর : গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবীর দে : শিক্ষক, নাটাগড় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির, সোদপুর।

দেবলীনা সেন : গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

রোহিত দাস : ছাত্র, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. শুভাশিষ গায়েন : প্রাক্তন গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী।

ড. অমৃতা ঘোষাল : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়।

ড. অন্তরা চৌধুরী : সহকারী অধ্যাপক, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়।

পরিমল মন্ডল : সহকারী শিক্ষক, সাহাবাজপুর উমাচরণ হাই স্কুল (উঃমাঃ)।

ড. শ্রীতা মুখার্জী : অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, জাকির হুসেন দিল্লী কলেজ সান্ধ্য, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. সুধাংশুকুমার সরকার : সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ।

১৯৫২ সাল থেকে বিদ্যা ভারতী দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০১৮ সালে বিদ্যা ভারতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থান স্থাপিত হয়েছিল উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে। এর অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের চিন্তায়-বাক্যে ও কর্মে এক গভীর ভারতীয় সত্তার পুনরুজ্জীবন।

বিদ্যা ভারতী উচ্চ শিক্ষা সংস্থান ও ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ সিন্ধি ল্যাঙ্গুয়েজ, ভারত সরকারের সহযোগিতায় ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ সালে, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা' বিষয়ক শিক্ষক সম্মেলন। এই সংকলন তারই ফলশ্রুতি। আশা করা যায়, বহুস্বরের মধ্য থেকে এক অন্তর্লীন ঐক্যের সুর প্রাণিত করবে পাঠকের অনুভব। জাগ্রত বিবেক সচেতন অংশগ্রহণে খুঁজে নেবে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার সমৃদ্ধিশালী ধারাকেই।

পা ড়ি

BHARATIYA JNANA PARAMPARA

9 788196 939182